গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা

বাঙ্গালা নাটক

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৩২

মূল্য—৫৲ টাকা

ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে এক বৎসরের "গিরিশ লেকচার" দিবার জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন। কয়টি বক্তৃতায় আমি বাঙ্গালা নাটক সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় প্রধান ঘটনাসমূহের উল্লেখ ও প্রধান নাটককারদিগের বিষয় ব্যক্ত করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করি।

সেই বক্তৃতা কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ইহা বাঙ্গালা নাটকের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নহে—ইংরেজীতে যাহাকে Landmarks বলে তাহাই।

ইহা যদি পাঠকদিগের আদর লাভ করে, তবে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

মধুসূদন হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্য্যন্ত
যাঁহারা বাঙ্গালা নাটক, প্রতিভার কিরণপাতে,
প্রস্ফুটিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের
কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া এই পুস্তক তাঁহাদিগের
স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম।

সূচীপত্র

বাঙ্গালা নাটক

১

উপক্রমণিকা

বাঙ্গালা নাটকের উদ্ভব বহুদিন পূর্ব্বে নহে। জাতির ইতিহাসে যেমন সাহিত্যের ইতিহাসেও তেমনই, এক শতাব্দী কাল সুদীর্ঘ বলা যায় না। তবে জাতির ইতিহাসে যেমন—সাহিত্যের ইতিহাসেও তেমনই—অপ্রত্যাশিত ও অতর্কিত পরিবর্ত্তন বন্যার মত প্রবাহিত হয়।

বাঙ্গালা নাটকের দুর্ব্বল প্রারম্ভের ইতিহাস-রচনার জন্য যে উপকরণ সাহিত্যের ইতিহাস-রসিকদিগের দ্বারা এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই স্বয়ং-সম্পূর্ণ কি না, বলা যায় না। ভবিষ্যতে অনুসন্ধান করলে হয়ত আরও নির্ভরযোগ্য উপকরণ সংগৃহীত হইবে। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে নির্ভর করিয়া 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-লেখক ডক্টর সুকুমার সেন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, 'কীর্ত্তি-বিলাস' ও 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটকদ্বয়ই বাঙ্গালায় প্রথম মুদ্রিত নাটক এবং "বাঙ্গালা কাব্যে আধুনিকতার হাওয়া বহিবার" ছয় বৎসর পূর্ব্বে এই নাটকদ্বয় প্রকাশিত হইয়াছিল।

রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' ঐ জাতীয় পুস্তকের সর্ব্বপ্রথম এবং সংগ্রহ-পুস্তক হিসাবে প্রশংসনীয়। উহা ১৯৩০ সংবতে প্রকাশিত হয় এবং তখন সাহিত্যিক-সমাজে

আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। উহা প্রকাশের অল্পদিন পরেই রাজনারায়ণ বসু 'বঙ্গভাষা-সমালোচনী সভা'র এক অধিবেশনে (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত) 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' অভিজ্ঞাত করেন। ঐ প্রবন্ধ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইলেও কয় বৎসর পূর্ব্বে প্রদত্ত কতকগুলি বক্তৃতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ঐ প্রবন্ধের ভূমিকায় বসু মহাশয় রামগতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থ ও খৃষ্টধর্ম্মযাজক লং-এর Descriptive Catalogue of Bengalee Books পুস্তক হইতে প্রাপ্ত সাহায্য স্বীকার করিয়া বলেন, বক্তৃতায় যাহা আছে, "তাহা কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐতিবৃত্তিক বিবরণ-বিষয়ক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, এমত নহে; নিজের জীবনের দর্শনও অনেক সহায়তা করিয়াছে।" আর গঙ্গাচরণ সরকার ঢাকা কলেজ ভবনে ১২৮৬ বঙ্গাব্দে (অর্থাৎ ১৮৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে) 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা' বিষয়ে বক্তৃতা পাঠ করেন। উহা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধদ্বয় বাঙ্গালায় নাটক প্রচারের অপেক্ষাকৃত অল্পদিন পরে রচিত। রাজ-নারায়ণ বাবু লিখিয়াছিলেন—"'ভদ্রার্জ্জুন' নাটক বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত নাটক।" মনে হয়, তিনিও 'কীর্ত্তি-বিলাসে'র অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না; কারণ, তাহা প্রথম প্রকাশিত বাঙ্গালা নাটক-দ্বয়ের অন্যতর হইলেও নাটক হিসাবে উল্লেখযোগ্য নহে। পরবর্ত্তী অনুসন্ধানে 'কীর্ত্তি-বিলাসে'র অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার গ্রন্থকারের নামও জানা যায় নাই।

গঙ্গাচরণ বাবু তাঁহার প্রবন্ধে 'ভদ্রার্জ্জুনে'রও নামোল্লেখ করেন নাই। তিনি "দৃশ্যকাব্য অথবা নাটক" আলোচনারম্ভে লিখিয়াছেন:—

"বঙ্গভাষায় পূর্ব্বে কোন দৃশ্যকাব্য দৃষ্ট হয় নাই। বঙ্গভাষায় বহুকাল হইতে বহুবিধ যাত্রা অভিনীত হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু সে সকল যাত্রা কোন রচিত নাটকের অভিনয় নহে এবং তত্তাবৎ

নাটকের নিয়মে অভিনীত হয় না। বঙ্গভাষায় নাটক রচনের চেষ্টা প্রথম ভারতচন্দ্র করিয়াছিলেন, তিনি মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত 'মহিষাসুর বধ' নাটকে নীত করিতে সযত্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু সফল-মনোরথ হইতে পারেন নাই; গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াই তিনি নিজে ভবনাট্য-লীলাখেলা সম্বরণ করেন। তাহার বহুদিন পরে 'বিল্বমঙ্গল নাটক'-নামে একখানি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচিত হয়, কিন্তু তাহা নামে নাটক, বস্তুত নাটকের লক্ষণ তাহাতে অল্পই ছিল। এই 'বিল্বমঙ্গল নাটক'-রচয়িতা, কবিকুলতিলক কালিদাসের প্রসিদ্ধ নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তল বঙ্গভাষায় নাটকাকারে অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু সেই অনুবাদে কালিদাসের কবিত্ব কিছুমাত্র সংরক্ষিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার বিফল পরিশ্রম হইয়াছে। সে যাহাই হউক, মান্যবর রাম-নারায়ণ ভট্টাচার্য্য ও দীনবন্ধু মিত্র—এই দুই জন মহোদয় বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে নাটক-রচয়িতা বলিয়া প্রথমে পরিচিত হয়েন, এবং বোধ হয়, শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটক বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে প্রথমেই অভিনীত হইয়াছিল; নাটকখানি উত্তম।"

গঙ্গাচরণ বাবু যাত্রাভিনয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালা যাত্রার যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে নৈপুণ্যসহকারে ঐ যাত্রার গুণ ও দোষ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম ভাগে (১২৭৯ বঙ্গাব্দ) ঐ প্রবন্ধের প্রথমাংশ প্রকাশ করেন। যাত্রার ইতিহাস—ইংরেজীতে—নিশিকান্ত চট্টো-পাধ্যায় রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তক ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়। ঢাকা অঞ্চলে 'স্বপ্ন-বিলাস' প্রভৃতি কয়খানি যাত্রা-পুস্তক অবলম্বন করিয়া নিশিকান্ত বাবু তাঁহার পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ঐ সকল যাত্রা এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ যেন মাতাইয়া তুলিয়াছিল। সে সকলের গান অতি মধুর; যথা—

"কৃষ্ণ-বৈমুখিনী আমি, সখি, এবে যদি মরি,
আমার কৃষ্ণবিলাসের এই দেহ ভাসাইও না সহচরি।"

নিশিকান্ত বাবুর পুস্তক অবলম্বন করিয়া 'বঙ্গদর্শন' নবম খণ্ডে (১২৮৯ বঙ্গাব্দে) "যাত্রার ইতিবৃত্ত" নামক একটি মনোজ্ঞ ও বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত হয়:—

"শুনিতে পাওয়া যায়, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যাত্রা ছিল, সে যাত্রা কেবল শক্তিবিষয়ক, কৃষ্ণযাত্রা তখন একেবারেই হইত না। চৈতন্যদেবের পর যখন বৈষ্ণব সম্প্রদায় জাঁকিয়া উঠিল, তখন কৃষ্ণলীলার যাত্রা আরম্ভ হইল।"

তখন লোক কৃষ্ণযাত্রা মাত্রকেই "কালীয়-দমন" যাত্রা বলিত। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধে দেখা যায়:—

"প্রায় চল্লিশ বৎসর হইতে চলিল, কালীয়-দমন যাত্রা এক প্রকার লোপ পাইয়াছে। চৈতন্যদেবের পর ইহার জন্ম, রাজা রামমোহন রায়ের পর ইহার মৃত্যু। ইহার আদিতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম, অন্তে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম। তাৎপর্য্য ভাল বুঝা যায় না। ভাগীরথী মনে আইসে। আদিতে বিষ্ণুপাদপদ্ম, শেষে সাগর। কিন্তু ভাগীরথীর ন্যায় 'কালীয়-দমন' কৃতকার্য্য হইয়াছে। সগরবংশ উদ্ধার না করুক, অনেক মরুভূমিতে রসসেচন করিয়াছে। ইহার আনুপূর্ব্বিক পরিচয় লেখা কঠিন। 'কালীয়-দমন' প্রায় চারিশত বৎসর জীবিত ছিল, এ জীবনী লিখিতে পারিলে ফল আছে।"

বলা বাহুল্য, লোকের রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ যাত্রার বিলোপ সাধিত হইয়াছিল। তবে কৃষ্ণ-যাত্রা রূপ-পরিবর্ত্তন করিয়া বহুদিন আত্মরক্ষা করিয়াছিল এবং আমাদিগের বাল্যকালেও আমরা নীলকণ্ঠের কৃষ্ণ-যাত্রার আদর দেখিয়াছি। সে আদরের প্রধান কারণ, সুরপ্রিয় বাঙ্গালীর মনোরঞ্জক গানের বাহুল্য। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি:—

"সজলজলদাঙ্গ সুত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুমূলে ;
হেরিলে হরে জ্ঞান মন, প্রাণ পড়ে পদতলে।

নবীন নটরাজ কে বিরাজে ব্রজমণ্ডলে ?
সাজ হেরি' লাজে দ্বিজরাজ নভোমণ্ডলে।
এমন মনোহরা মাধুরী না হেরি মহীমণ্ডলে।
প্রখর-প্রভাকর-কিরণ-কর মকর-কুণ্ডলে ;
উচ্চশিখিপুচ্ছ শিরে, পুচ্ছচূড়া বামে হেলে,
তুচ্ছ করে জাতিধর্ম্ম, মূর্চ্ছা করে নারীকুলে।
মধুর মৃদু হাসিরাশি সুধা ক্ষরিত করে—
বাদ্য করি বাঁশী—মন উদাসী করিতে পারে।
নীলকণ্ঠে ভনে, ক্ষণে ক্ষণে অচেনায় চিনিতে পারে—
যে চিনিতে পারে, জিনিতে পারে, কিনিতে পারে বিনামূলে।"

দাশুরায়ের পাঁচালীতেও কৃষ্ণলীলাসংক্রান্ত পালার আদর অধিক ছিল—ছড়ার জন্যও বটে, গানের জন্যও বটে। গানে মুন্সীয়ানার অভাব ছিল না—

"হৃদি-বৃন্দাবনে বাস, যদি কর কমলাপতি !
ওহে ভক্তপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধাসতী ॥
মুক্তি-কামনা আমারি হবে বৃন্দে গোপনারী
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী ॥
আমার ধর ধর, জনার্দ্দন, পাপ-ভার গোবর্দ্ধন—
কামাদি ছয় কংস-চরে ধ্বংস কর সংপ্রতি ॥
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী মন-ধেনুকে বশ করি
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে পূরাও ইষ্ট এই মিনতি ॥
আমার প্রেমরূপ যমুনা-কূলে আশা-বংশীবট-মূলে
সদয়-ভাবে স্বদাস ভেবে সতত কর বসতি ॥
যদি বল, রাখাল-প্রেমে বন্দী আছি ব্রজ-ধামে
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হবে হে দাশরথি ॥"

লোকের রুচি-পরিবর্ত্তনের কারণসমূহের মধ্যে ইংরেজী নাটক পাঠ ও ইংরেজের রঙ্গালয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদুভয়ের অনুসরণ করিয়া যাত্রাও কিছুদিন জীবনরক্ষায় সমর্থ হইয়াছে।

ইংরেজ যে স্থানেই বাস করে, সেই স্থানেই আনন্দসম্ভোগকল্পে রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত উইল্‌সের কলিকাতার মানচিত্রে দেখা যায়—ওল্ডকোর্ট হাউসের নিকটে ইংরেজদিগের রঙ্গালয় ছিল। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও কলিকাতায় ঠিকাগাড়ীর চালকরা থিয়েটার রোডকে "পুরানা নাচ-ঘরকি রাস্তা" বলিত। তখন বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট—কশাইটোলার রাস্তা, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট—রাণী মুদিনীর গলি—ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল।

ইংরেজদিগের রঙ্গালয়ে ইংলণ্ড হইতে আগত অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা ইংরেজী নাটকের অভিনয় করিত। যখন সেক্সপীয়রের নাটক অভিনীত হইত, তখন দর্শকদিগের মধ্যে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর অভাব হইত না। ইহার বহুদিন পরে ব্যাণ্ডম্যান তাঁহার দল লইয়া এ দেশে অভিনয় করিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন—তিনি কেশবচন্দ্র সেনকে সেক্সপীয়রের ওথেলোর আদর্শ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

কেবল ইংরেজী নাটকের অভিনয়েই কোন কোন ইংরেজ পরিতৃপ্ত হইতেন না। ১৭৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ান লেবেডেফ নামক এক ব্যক্তি তাঁহার বাঙ্গালা-শিক্ষক গোলোকনাথ দাসের সাহায্যে দুইখানি ইংরেজী প্রহসন বাঙ্গালায় অনুবাদ করাইয়া এক-খানি বাঙ্গালী নট-নটীদিগের দ্বারা অভিনয় করাইয়াছিলেন। এই সব নট-নটী তিনি কিরূপে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে কৌতূহল স্বাভাবিক হইলেও কৌতূহল-পরিতৃপ্তির উপায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, বাঙ্গালায় ব্যক্তিগত বা সাধারণ রঙ্গালয়ে যখন প্রথম বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়, তখনও পুরুষের দ্বারা নারীর অংশ অভিনীত হইত।

কোন কোন ইংরেজ আবার ভারতীয়দিগের আচার-ব্যবহারের নিন্দাদ্যোতক নাটক বা প্রহসন রচনা করিয়া অভিনয় করিতেন। যাঁহারা এইরূপ কার্য্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ডেভ কার্শন তাঁহাদিগের অন্যতম। তাঁহার ঐ জাতীয় একখানি প্রহসনের উত্তরে কয়জন বাঙ্গালী ছাত্র ইংরেজদিগের আচার-ব্যবহার ব্যঙ্গবিদ্ধ করিয়া এক প্রহসন রচনা করেন। তাহা করিন্থিয়ান রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তাহার একটি গান এইরূপ ছিল :—

"If you really love me, Dear,
I promise you to marry.
I will take you to Jarbo's church
In a গরুকে গাড়ী,
In Chunam Gully where সাহেব লোক reside
I will house you in a খোলাকে বাড়ী ;
শুটকী মাছ and brinjal,
Onion, potato and মুসূর কি ডাল,
I will let you have plenty of all
As much as you can curry"—ইত্যাদি

চূণাগলি বহুবাজার অঞ্চলে—১৮৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে ফিয়ার লেনে পরিণত—ফিরিঙ্গিদিগের বাসস্থান। পাদরী জারবোর গির্জ্জা নেবুতলা অঞ্চলে ছিল; তাহাতে যে কোন পুরুষ ও নারী বিবাহিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই পাদরী বিনাবাক্যব্যয়ে (অবশ্য বিনা-পারিশ্রমিকে নহে) তাহাদিগকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিতেন। ইহাই The Old Church of St. James—সাধারণতঃ "নেড়া গির্জ্জা" নামে পরিচিত ছিল—কারণ, গির্জ্জাটি মৃত্তিকায় নামিয়া যাইতেছে দেখিয়া ইহার চূড়া নির্ম্মাণ করা হয় নাই। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইহা ভূমিসাৎ হয়। (See 'Bengal Past and Present'—January-July, 1908).

অল্পকালমধ্যেই কলিকাতার ইংরেজী-শিক্ষিত ধনিসম্প্রদায়ে ইংরেজী রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে রঙ্গমঞ্চ রচনা করিয়া নাটক অভিনয়ের বাসনা ও আগ্রহ আত্মপ্রকাশ করে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই সম্প্রদায়স্থদিগের অন্যতম ছিলেন। তিনি আপনিও নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক তাঁহার রচনা—'পুরাতন প্রসঙ্গে' জানা যায়. তিনি একখানি কৌতুকনাট্য রচনাও করিয়াছিলেন, তাহার নাম—'বুঝলে কি না'। বিডন ষ্ট্রীটের রামদুলাল সরকারের পুত্র "সাতুবাবু"র (আশুতোষ দেব) যেমন, পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ভ্রাতৃদ্বয়েরও তেমনই ঐ সখ ছিল। এই সিংহ ভ্রাতৃদ্বয়কে মধুসূদন তাঁহার রচিত 'শর্ম্মিষ্ঠা-নাটক' উৎসর্গ করেন :—

"আমি এই দৈত্যরাজবালা শর্ম্মিষ্ঠাকে মহাশয়দিগকে অর্পণ করিতেছি। যদি ইনি আপনাদের এবং শ্রোতৃবর্গের অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্রী হয়েন, তবেই আমার পরিশ্রম সফল হইবে এবং আমিও কৃতকার্য্য হইব।

"মহাশয়দিগের বিদ্যানুরাগে এদেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য। আমি এই প্রার্থনা করি যে, আপনাদিগের দেশহিতৈষিতাদি গুণরাগে এ ভারতভূমি যেন বিদ্যাবিষয়ক স্বীয় প্রাচীন শ্রী পুনর্ধারণ করেন।"

বাঙ্গালা নাটক রচিত হইবার পূর্ব্বে যে যাত্রা প্রচলিত ছিল, তাহাতে রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন হইত না—ভূমিতেই "আসর" রচনা করা হইত এবং দৃশ্য-পটের ব্যবহার ছিল না। সাধারণতঃ পৌরাণিক ঘটনাবলম্বনেই অভিনয়ের "পালা" রচিত হইত। কিন্তু সকল শ্রেণীর লোকের মনোরঞ্জনের জন্য যাত্রা গাহনা হইত বলিয়া সময় সময় অকারণ হাস্যোদ্দীপন-জন্য সং আনিতে হইত। সং আসরে আসিয়া যে অভিনয় করিত, তাহা সকল সময় সুরুচি-সঙ্গত হইত না এবং সে সময় সময় অবান্তর উক্তি করিত। সং আসিয়া হয়ত

জিজ্ঞাসা করিত, তাহার জাতি নির্ণয় কে করিতে পারেন ? এক জন হয়ত তাহার পরিচয় চাহিত এবং সে তাহার উত্তরে বলিত :—

"আমার ঠাকুরদাদা জাত গোয়ালা—
ঠাকরুণদিদি উড়ে,
আমার বাপ ছিল সাপুড়ে।"

তাহাতে দর্শকদিগের মধ্যে এক দল হাস্য করিত। এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই, বোধ হয়, মধুসূদন তাঁহার 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে'—"প্রস্তাবনা"য় একটি গান সংযোজিত করিয়াছিলেন (রাগিণী খাম্বাজ —তাল মধ্যমান) :—

"মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়,
যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময় !
শুন গো ভারতভূমি,
কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুমঘোর,
হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস,
কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্যরঙ্গে
মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে,
বিষবারি পান করে
তাহে হয় তনুমনঃক্ষয়।

মধু বলে, জাগ মাগো,
বিভুস্থানে এই মাগ
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয়নিচয় ॥"

মধুসূদন যে সংস্কৃত কবিদিগের কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের রচনা যত উচ্চস্তরেরই কেন হউক না—বাঙ্গালা নাটক তাঁহাদিগের রচনার অনুকরণে লিখিত হয় নাই। কালিদাসের শকুন্তলা পাঠ করিয়া মহাকবি তত্ত্বদর্শী গেটে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—

"বসন্তের কুল্ল ফুল, শরতের ফলের মিলন,
পুষ্ট তিরপিত আত্মা—মোহে যাহে মানবের মন,
স্বর্গ মর্ত্ত উভয়ের একস্থানে অপূর্ব্ব মিলন—
'শকুন্তলা!' 'শকুন্তলা!' কিবা আর আছে অকথন ?"

সত্যই রচনার ইহা অপেক্ষা আর উচ্চ স্তুতি হইতে পারে না।

সংস্কৃত নাটক গ্রীক বা অন্য কোন নাটকের প্রভাবে প্রভাবিত নহে। তাহা সর্ব্বতোভাবে ভারতীয়—ভারতীয়ের মনোরঞ্জন-জন্য ভারতীয় কবি কর্ত্তৃক রচিত—ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন। ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য এই যে, একদিকে অভ্রভেদী-শিখরসম্পন্ন হিমাচল—আর অন্য কয় দিকে উত্তুঙ্গতরঙ্গসঙ্কুল সাগর এই দেশকে প্রতিবেশী দেশসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহার অধিবাসীদিগকে স্বতন্ত্র সংস্কৃতির উদ্ভব করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। সেইজন্য ভারতীয় প্রকৃতি, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সাহিত্য ও ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত—বাঙ্গালা নাটকও সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত রচনার প্রভাব-মুক্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু বাঙ্গালা নাটকের আদর্শ সংস্কৃত নাটক নহে। বাঙ্গালায় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইলে সংস্কৃত নাটকের

অনুবাদে ও অনুকরণে রচিত অনেক নাটক অভিনীত হইয়াছিল—কিন্তু লোকের প্রীতি অর্জ্জন করিতে পারে নাই।

এদিকে ইংরেজী নাটক পাঠে ও ইংরেজের রঙ্গালয়ে অভিনয়-দর্শনে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায় প্রথমে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং সেই আকর্ষণ সেই সমাজ হইতে দেশের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্তিলাভ করিতেছিল। বাঙ্গালা প্রথম নাটকদ্বয়ের আদর্শ ইংরেজী নাটক। 'কীর্ত্তি-বিলাস' ও 'ভদ্রার্জ্জুন' সমসাময়িক; 'কীর্ত্তি-বিলাসে'র প্রকাশকাল ১২৫৮ বঙ্গাব্দ, 'ভদ্রার্জ্জুনে'রও প্রায় তাহাই। তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বা অনুসরণ হইয়াছিল। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে কাদিহাটী-নিবাসী বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন অনূদিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকই এই শ্রেণীর প্রথম রচনা। উহা ১২৪৬ বঙ্গাব্দে (অর্থাৎ 'কীর্ত্তি-বিলাস' প্রকাশের প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে) রচিত হইয়াছিল, কিন্তু গ্রন্থকারের মৃত্যুহেতু একত্রিশ বৎসর পরে প্রথম প্রকাশিত হয়।

'ভদ্রার্জ্জুন' নাটকের লেখক তারাচরণ শীকদার। উহা কলিকাতা চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। 'কীর্ত্তি-বিলাস' নাটকের গ্রন্থকার কে, সে বিষয়ে অনুমান ব্যতীত প্রমাণ নাই। কিন্তু 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটকের লেখকের নাম পাওয়া গিয়াছে। তবে তাঁহার পরিচয় যে পাওয়া যায় নাই, তাহা দুঃখের বিষয়। তাঁহার নাটকের "বিজ্ঞাপন" বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন অমূল্য—বাঙ্গালা নাটকের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তেমনই পথিপ্রদর্শক।

তিনি লিখিয়াছিলেন:—

"বহুকালাবধি সকল জাতির মধ্যেই নাটক প্রচলিত আছে এবং বঙ্গভূমিতে তৎসম্বন্ধীয় অভিনয়াদি দর্শন করিয়া অনেকে আমোদ প্রকাশ করেন। এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত আছে এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এদেশে নাটকের

ক্রিয়াসকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীতদ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনাই ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয়, কোন উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় আদি পর্ব্ব হইতে সুভদ্রা-হরণ নামক প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম। ইহা দ্বারাই যে সেই অভাব একেবারে দূরীভূত হইবে এমন নহে; কিন্তু এই পুস্তক অপক্ষপাতী পাঠক মহাশয়দিগের তুষ্টিকর হইলে আদর্শস্বরূপ হইতে পারে। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে এতদ্দেশীয় সুকবিগণ কর্ত্তৃক উত্তম উত্তম বহুবিধ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া দৃঢ়বদ্ধমূল সেই অভাবকে অবশ্যই উন্মূলন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

"এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, অতএব তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয়-বিষয়ে ইওরোপীয় নাটক-প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; যথা প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহাদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইওরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইংরাজী ভাষায় (Act) এক্ট কহে; কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট যেরূপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত (Scene) সিন শব্দের পরিবর্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থান ঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) সিন কহে। যথা, কবিবর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর নামক গ্রন্থের প্রথমে কাঞ্চীপুরে ভট্টের গমন ও সুন্দরের সহিত তাহার কথোপকথন। যদ্যপি ঐ কাব্য

নাটক-প্রণালীতে রচিত হইত, তবে কাঞ্চীপুরের রাজপুরী প্রথম অঙ্কের প্রথম সংযোগস্থল হইত। নাটক-নির্ণীত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি প্রায় ইওরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়। ইওরোপীয়দিগের স্বতন্ত্র নেপথ্যের প্রয়োজন থাকে না, যেহেতু তাহারা এতদ্দেশীয় কুশীলবগণের ন্যায় স্বতন্ত্র স্থান হইতে সজ্জাদি করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে না। অতএব এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।"

নাটক হিসাবে 'ভদ্রার্জ্জুনে'র মূল্য যত সামান্যই কেন হউক না, নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের জন্য ইহার গৌরব—পথিপ্রদর্শকের। বঙ্কিমচন্দ্র 'আলালের ঘরের দুলাল' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, 'ভদ্রার্জ্জুন' সম্বন্ধে তাহাই বলিতে হয়:—

"উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে'র দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।"

পথিপ্রদর্শকের গৌরবের অংশ 'কীর্ত্তি-বিলাসে'র প্রাপ্য। ইহার ভূমিকায় বিষাদান্ত নাটক রচনার সমর্থনে যুক্তি প্রদান করা হইয়াছে। ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন:—

"অস্মদ্দেশীয় লোকেরা করুণাভিনয় করিয়া অবশেষে সেই ব্যক্তির সুখাভিনয় করিবে— ইহা না করিলে অধর্ম্মভোগী হইতে হইবে তাহা স্থির জানিতেন। অদ্যাবধি যাত্রার সময়ে অধিকারী কোন বীরের মরণানন্তর সে বীরের উদ্ধার না করিয়া যাত্রা বন্ধ করে না।"

এই সংস্কারের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য গ্রন্থকার লিখিয়াছেন:—

"অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে যে, যে অভিনয় অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয়

দর্শন করিতে কিরূপে মানবগণ স্বভাবতঃ অভিলাষী হইবে! অত্যল্প বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে শোকজনক ঘটনা অন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, একারণ সেক্‌সপীয়ার-নামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি লিখিয়াছেন :—

'আমার অন্তর শোকানলে দহন হইতেছে, তথাপি আমার মন অবিরত ঐ শোকপ্রয়াসী।' "

ঐ ভূমিকায় আরও লিখিত হয় :—

"দেশবিশেষে মানবগণের মনের ভাব ভিন্ন হয়। শীতলদেশ-নিবাসিগণ স্বভাবতঃ প্রগাঢ় চিন্তায় মত্ত হইতে অভিলাষ করে, কিন্তু উষ্ণদেশীয় লোকেরা হাস্তরসে প্রবৃত্ত। বঙ্গদেশ অতিশয় উষ্ণ সুতরাং বঙ্গদেশীয় লোকেরা হাস্তরসাভিনয় অবলোকন করিতে সদাই অভিলাষী।"

আর একটি উক্তি :—

"উষ্ণ দেশীয় লোকেরা প্রেমবিষয়ে বিশেষরূপ অনুরাগী, সুতরাং বঙ্গদেশীয় মানুষসমূহ প্রেমবিষয়ক রচনা পাঠ করিতে বাসনা করে।"

এই সকল মন্তব্যই যে যুক্তিসহ এমন বলা যায় না। কারণ, এ দেশে যেমন করুণাভিনয় অনাদৃত ছিল, তেমনই ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রাজনীতিক ব্রাইট উপন্যাসে দুষ্টচরিত্রাঙ্কনের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিতেন, পৃথিবীতে পাপতাপের অভাব নাই—উপন্যাসে আবার তাহার অবতারণা কেন? এ দেশের অধিকাংশ লোক তেমনই আনন্দান্ত অভিনয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, গোষ্ঠ-কীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে পাঠাইয়া আবার গৃহে আনিয়া পালা শেষ করার রীতি। সে হিসাবে "করুণাভিনয়"সম্বন্ধীয় ধারণা সত্য হইতে পারে। কিন্তু সপ্তরথী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর মৃত্যুর মত বিষাদান্ত ব্যাপার আর কি হইতে পারে?

উষ্ণপ্রধান স্থানের অধিবাসীরা যে "প্রগাঢ় চিন্তায় মত্ত থাকিতে অভিলাষ করে" তাহার প্রমাণ, এ দেশের মনীষীদিগের বিরাট কীর্ত্তি

ষড়্দর্শনাদি। বরং বলা যায়, এ দেশের লোক হাস্যরসের আদরে আগ্রহশীল নহে।

প্রেমসম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে ইংরেজ কবি বায়রণের উক্তি মনে পড়ে :—

"The cold in clime are cold in blood,
Their love can scarce deserve the name."

'কীর্ত্তি-বিলাস' ও 'ভদ্রার্জ্জুন' প্রকাশের পরেই বাঙ্গালায় যে বহু নাটক প্রকাশিত হয়, তাহাতে মনে করা যাইতে পারে, দেশ তখন নাটকের জন্য উন্মুখ হইয়া ছিল।

রাজনারায়ণ বাবু 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটকের উল্লেখান্তে বলেন :—

"ভূতপূর্ব্ব ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট বাবু হরচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গালা ভাষায় দ্বিতীয় নাটক রচনা করেন। সে নাটকের নাম 'ভানুমতীচিত্ত-বিলাস,' তাহা সেক্সপীয়ারের 'মারচেণ্ট অব বেনিস' নামক নাটকের আদর্শ করিয়া লিখিত। গম্ভীর ভাবের প্রথম শ্রেণীর নাটক এখনও আমাদিগের ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম শ্রেণীর হাস্যকর নাটক প্রকাশিত হইয়াছে বটে; রামনারায়ণ তর্করত্ন ও দীনবন্ধু মিত্র তাহাদিগের প্রণেতা। ইহার মধ্যে রামনারায়ণ শ্রেষ্ঠ। ইঁহাদিগের প্রণীত গম্ভীর নাটকের যে স্থানে হাস্যরসের বর্ণনা আছে, সেখানে প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। গম্ভীর নাটক-রচয়িতা-দিগের মধ্যে নবীন তপস্বিনী ও লীলাবতী নাটক-প্রণেতা দীনবন্ধু মিত্র, শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী নাটক-প্রণেতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিধবা-বিবাহ নাটক-প্রণেতা উমেশচন্দ্র মিত্র, নব-নাটক-প্রণেতা রামনারায়ণ তর্করত্ন, রামাভিষেক ও সতী-নাটক-প্রণেতা মনোমোহন বসু, পুরু-বিক্রম ও সরোজিনী নাটক-প্রণেতা সাধারণের অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি*, শরৎ-সরোজিনী ও সুরেন্দ্র বিনোদিনী

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাটক-প্রণেতা উপেন্দ্রনাথ দাস এবং কুলীন-কন্যা-প্রণেতা লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রধান। মনোমোহন বসুর অন্তর্জ্জগৎ বর্ণনাতে যেমন পারগতা আছে, বাহ্যজগৎ বর্ণনাতেও তেমনই পারগতা আছে। * * * * প্রহসনের মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

গঙ্গাচরণ বাবু 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের উল্লেখ করিয়া লিখেন :—

"ইহা এতদ্দেশীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কদাচার প্রদর্শন এবং দমন করিবার উদ্দেশ্যে বিরচিত হয়; এবং ইহার গ্রন্থকর্ত্তা স্বয় পাণ্ডিত্য ও কৌশল শক্তি যথেষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কবিবর দীনবন্ধু মিত্রের প্রসিদ্ধ নাটক 'নীলদর্পণ'। এই গ্রন্থের খ্যাতি কেবল কবিত্বগুণে নহে, লং সাহেবের কারাবাস বশতও হইয়াছে। 'নীলদর্পণে' দুর্ব্বৃত্ত নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে,—ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তা স্বীয় কৌশল এবং কল্পনা-শক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন এবং ইহাতে যে সকল চিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহা পরিস্ফুটতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু 'নীলদর্পন' কিছু দীর্ঘ আয়ত এবং ইহাতে বীররস অথবা মধুররস অতি বিরল, এইজন্য ইহার অভিনয় সর্ব্বদা সকলের কাছে মনোরঞ্জক হয় না। আমার বিবেচনায় দীনবন্ধু বাবুর বিরচিত নাটকাবলির মধ্যে 'লীলাবতী' সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তাঁহার প্রহসন-মধ্যে 'সধবার একাদশী' অতি মনোহর। এইস্থানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, কবিবর মধুসুদন দত্তের প্রণীত 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—এই দুইখানি প্রহসন এই শ্রেণীর কাব্যমধ্যে অতি প্রশংসনীয়। অনন্তর বাবু উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' একখানি গণনীয় দৃশ্যকাব্য; ইহাতে যুবক কবি নাটক-রচনার ক্ষমতা ও নৈপুণ্য প্রচুর ভাবে দেখাইয়াছেন এবং ইহার অভিনয় প্রায় সর্ব্বদাই আনন্দকর হইয়া থাকে।"

বন্যার জল যখন নদীতে প্রবেশ করে, তখন তাহা অনেক আবর্জ্জনাও বহিয়া আনে। বাঙ্গালায় নাটক-রচনারম্ভেও তাহাই হইয়াছিল। পূর্ব্বে রাজনারায়ণ বাবুর যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার উপসংহারে তিনি বলেন :—

"এক্ষণে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে পঙ্গপালের ন্যায় নাটক বহির্গত হইতেছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ নাটকের সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যাহা বলিতেন, তাহা খাটে—'না টক না মিষ্টি'।"

গঙ্গাচরণ বাবুর মন্তব্য কঠোর :—

"আরও অনেকগুলি নাটক বঙ্গভাষায় প্রচারিত হইয়াছে,—এমন কি তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর, কিন্তু তত্তাবতের আলোচনা করার সময়ও নাই, প্রয়োজনও নাই। তবে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, তাহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট নাটক অতি অল্প, অধিকাংশই অশ্রদ্ধেয় ও অপাঠ্য। সাহিত্য আগারে কেবল আবর্জ্জনা মাত্র।"

যে সময় 'ভদ্রার্জ্জুন' প্রকাশিত হয়, তখনও বাঙ্গালা ভাষা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষম হয় নাই। অর্থাৎ তাহা তখনও আনন্দে উচ্ছ্বসিত, বিষাদে বিকুঞ্চিত, ক্রোধে উদ্বেলিত, ঘৃণায় বিকুন্তিত, করুণায় বিগলিত, দ্বিধায় বিচলিত, প্রীতিতে উচ্ছলিত হয় না। সেই জন্য 'ভদ্রার্জ্জুনে'র গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

"বাঙ্গালা ভাষা এখনও নবীনা ও অলঙ্কার-পরিহীনা এবং তাঁহার দরিদ্রাবস্থারও শেষ নাই। সংস্কৃত হইতে উপযুক্ত অলঙ্কারাদি আহরণ না করিলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী করা যায় না। যাহা পাঠ করিলে পাঠকবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর পাঠেচ্ছার আবির্ভাব হয়, ইহাকেই সুভাষা কহা যায়। কেবল কোমল কিম্বা অতি কঠিন শব্দ প্রয়োগ করিলেই যে ভাষার চিত্তাকর্ষিণী শক্তি জন্মে এমত নহে; কিন্তু তাহার জীবন-স্বরূপ অর্থ-সৌন্দর্য্য না থাকিলে সকলই নিষ্ফল। অতএব তাহার প্রাণ প্রদানপূর্ব্বক অলঙ্কারাদি দ্বারা তদীয় সৌন্দর্য্যকে অধিকতর জাজ্বল্যমান করাই

কর্ত্তব্য ; তাহা হইলে নাটকাদি গ্রন্থসকল সমীচীনরূপে রচিত হইতে পারে।"

১২৫৮ বঙ্গাব্দে এই কথা লিখিত হয়। তখন বাঙ্গালায় যে ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহা দুই প্রকার—সাধুভাষা ও অপর ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"আমি নিজে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না—'খদির' বলিতেন; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না—'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ 'ঘৃতে' নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না—'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না—'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। * * * পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত, কেন না কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না।"

এই ভাষার বিরুদ্ধে প্যারীচাঁদ মিত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' ১২৬১ বঙ্গাব্দ হইতে প্রকাশ আরম্ভ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'।

কিন্তু যে দুইজন ঐন্দ্রজালিকের দণ্ডস্পর্শে বাঙ্গালা ভাষা অচির-কালমধ্যে সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষম ও মনোরমসৌন্দর্য্যসম্পন্ন হইয়াছিল, তখন তাঁহাদিগের আবির্ভাবের বিলম্ব ছিল না। তাঁহারা মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় লিখিয়াছেন :—

"তিনি আপনার শিক্ষাগর্ব্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা, আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য্য, প্রেম, মহত্ত্ব, ভক্তি, স্বদেশানুরাগ—শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিত ভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরমসৌভাগ্যগর্ব্বে সেই অনাদরমলিন ভাষার মুখে অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।"

আর অরবিন্দ লিখিয়াছেন, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র একটি ভাষা, একটি সাহিত্য ও একটি জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন :—

"Bankim Chandra and Madhu Sudan have given the world three noble things. They have given it Bengali literature, a literature whose princelier creations can bear comparison with the proudest classics of modern Europe. They have given it the Bengali language. The dialect of Bengal is no longer a dialect, but has become the speech of Gods, a language unfading and indestructible—which cannot die except with the death of the Bengali nation; a people spirited, bold, ingenious and imaginative, high among the most intellectual races of the world, and if it can but get perseverance and physical elasticity, one day to be high among the highest. This is surely a proud record. Of them it may be said in the largest sense that they, being dead, yet live. And when posterity comes to crown with her praises the Makers of India, she will place her most splendid laurel not on the sweating temples of a place-hunting politician nor on the narrow forehead of a noisy social reformer, but on the serene brow of that gracious Bengali who never clamoured for place or power, but did his work in silence for love of his work, and even as nature does, and just

because he had no aim but to give out the best that was in him, was able to create—a language, a literature and a nation."

বাঙ্গালার যে দুইজন সাহিত্যিক অসাধারণ প্রতিভা প্রযুক্ত করিয়া প্রয়োজনানুরূপ ভাষা গঠিত করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারা তখন আর দূরবর্ত্তী নহেন এবং তাঁহাদিগের অন্যতর—মধুসূদন—কয় বৎসর পরেই নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এই সঙ্গে দীনবন্ধুর নামোল্লেখ করিতে হয়।

'ভদ্রার্জ্জুন'-লেখক নাটকের প্রশংসা "আভাসে" লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"সকল কাব্যের মধ্যে নাটক প্রধান।
সর্ব্বস্থলে নাটকের আদর সমান॥
সভ্য কি অসভ্য জাতি পৃথিবীনিবাসী।
এ রস দর্শনে হয় সবে অভিলাষী॥"

তারাচরণ সীকদার "বাঙ্গালা ভাষার অপূর্ণতা—বাঙ্গালায় নাটকের সমৃদ্ধির অভাবের জন্য দায়ী"—এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—ভাষাকে প্রয়োজনানুরূপভাবে গঠিত করিতে পারেন নাই।

গঙ্গাচরণ বাবু সেজন্য লেখকদিগকে দায়ী করিয়াছিলেন :—

"নাটক-রচনা অতি কঠিন কার্য্য; কেবল কতকগুলি নর-নারীর কথোপকথনে নাটক হয় না ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তা নিজে কথা কহেন না, অথচ তাঁহাকে কোন ঘটনাঘটন, কিম্বা কোন নৈসর্গিক দর্শন অথবা কোন নরনারীর চরিত্র বা অন্তর্ভাব এরূপে দেখাইতে হইবে যে, যেন তাহা প্রকৃত অথচ চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী হয়। সুতরাং যিনি অতি উন্নত কবি এবং প্রকৃতির বিবিধ রূপ দর্শন করিয়া হৃদয়গ্রহ করিয়াছেন ও মানব-চরিত্র বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং যাঁহার রচনা-শক্তি সুনিপুণ ও কৌশল-শক্তি অসাধারণ, তিনিই যথার্থ নাটক-রচয়িতা হইতে পারেন। তিনিই

সেক্সপিয়র অথবা কালিদাস কিম্বা ভবভূতি হইতে পারেন। এরূপ কবি বঙ্গসাহিত্যে অদ্যাপি কেহ অবতীর্ণ হয়েন নাই। ফলতঃ এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় যত নাটক হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রকৃত নাটক একখানিও নাই, কিন্তু ভরসা করি অবিলম্বে এই অভাবের অপনয়ন হইবে।"

গঙ্গাচরণ বাবুর আশা পূর্ণ হইয়াছে কি না এবং তাহা পূর্ণ হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে তিনি যে তিনজন নাটক-লেখকের নামোল্লেখ করিয়াছেন— কাল নিরবধি ও পৃথিবী বিপুলা হইলেও দ্বিতীয় সেক্সপীয়রের বা কালিদাসের বা ভবভূতির আবির্ভাব সম্ভব কি না, সন্দেহ। "মৌক্তিকং ন গজে গজে।" ইংলণ্ডে দ্বিতীয় সেক্সপীয়রের আবির্ভাব সম্ভব হয় নাই; ভারতবর্ষেও দ্বিতীয় কালিদাস বা ভবভূতির আবির্ভাব সম্ভব হয় নাই। সুতরাং বাঙ্গালা নাটক-লেখকদিগকে সেক্সপীয়র, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির তুলিত করিবার কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না।

গঙ্গাচরণ বাবু যে সময়ের কথা লিখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, সে সময়ে যে তাঁহার মত সমালোচকও মধুসূদনের ও দীনবন্ধুর আবির্ভাবে উন্নতির সূচনা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। শুনিয়াছি, তাঁহার নাটকে সৃষ্ট কোন চরিত্রের সহিত দীনবন্ধুর সৃষ্ট কোন চরিত্রের সাদৃশ্য আছে, একজন ইহা বলিলে গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাহা নিন্দা মনে না করিয়া প্রশংসা মনে করিয়া বলিয়াছিলেন—মধুসূদন ও দীনবন্ধু ব্যতীত কি বাঙ্গালা নাটক হইতে পারিত?

তখন বাঙ্গালা নাটক রচনার আরম্ভ। আর তখন পেশাদারী রঙ্গালয় ও অভিনেতা অভিনেত্রী নাই। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছিলেন :—

"সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে, সাহিত্য একটি

ব্যবসায় হওয়া চাই, আজিও তাহা দাঁড়ায় নাই * * যাহাতে সাহিত্য ব্যবসায় হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।"

অর্থাৎ যতদিন সাহিত্য-ব্যবসায়ীরা সেই ব্যবসায়-অর্জ্জিত অর্থে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে না পারিবেন, ততদিন বাঙ্গালা সাহিত্য বহু উপযুক্ত লোককে আকৃষ্ট করিতে পারিবে না—সে সাহিত্যের উন্নতির গতি মন্থর থাকিবে। তেমনই যতদিন রঙ্গালয় ব্যবসা হিসাবে না চলে, ততদিন নাটক-লেখক, অভিনেতা প্রভৃতি "সখের" কাযে অধিক মনোযোগ দিতে পারেন না।

ইংরেজী সাহিত্যে জনশন লর্ড চেষ্টারফিল্ডকে সদর্পে বলিয়াছিলেন, সাহিত্যিকরা আর ধনীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবেন না। অর্থাৎ অতঃপর তাঁহারা সাহিত্য-সেবা ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারিবেন। যতদিন বাঙ্গালা নাটককার, অভিনেতা প্রভৃতি বলিতে পারেন নাই, দর্শকদিগের আদর তাঁহাদিগের সংসারিক অভাব মোচন করিবে, ততদিন নাটক-রচনায় অনেকে আবশ্যক মনোযোগ প্রদান করেন নাই।

পূর্ব্বে বাঙ্গালায় রঙ্গালয় ধনীর অবসর-বিনোদনের ও প্রসিদ্ধিলাভের সোপান মাত্র ছিল। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যৌবনে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকে কুলাচার্য্য সাজিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, (১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতা শ্যামবাজার নিবাসী নবীনচন্দ্র বসু লক্ষটাকা ব্যয় করিয়া স্বীয় গৃহে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় করাইয়াছিলেন। তাহার পরে প্রথম পর্ব্ব চড়কডাঙ্গা রোডে (বর্ত্তমান ঠাকুর কাশল ষ্ট্রীট) রামজয় বসাকের বাড়ীতে; দ্বিতীয় পর্ব্ব সাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) গৃহে; তৃতীয় পর্ব্ব দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের উত্তরাধিকারী পাইকপাড়ার সিংহদিগের বাড়ীতে; চতুর্থ পর্ব্ব কালীপ্রসন্ন সিংহর গৃহে; পঞ্চম পর্ব্ব সিঁদুরিয়া পটীতে মেট্রোপলিটন কলেজে; ষষ্ঠ পর্ব্ব ঠাকুরদিগের বাড়ীতে (প্রথমে গোপীমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে ও পরে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে

ও তাঁহার বাগানে)। সপ্তম পর্ব্ব সম্বন্ধে মহেন্দ্র বাবু বলেন—"অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী সান্ন্যালদিগের বাড়ীতে পেশাদারী থিয়েটার খুলিলেন। 'নীলদর্পণ' অভিনীত হইল। তখনও পুরুষে স্ত্রীলোক সাজিত। আমরা retire করিলাম।"

প্রথম পর্ব্বে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব'; দ্বিতীয় পর্ব্বে 'শকুন্তলা'; তৃতীয় পর্ব্বে 'রত্নাবলী' ও 'শর্ম্মিষ্ঠা'; চতুর্থ পর্ব্বে 'বেণীসংহার'; এবং পঞ্চম পর্ব্বে 'বিধবাবিবাহ' অভিনীত হয়। ষষ্ঠ পর্ব্বে অভিনীত—

(১) 'মালবিকাগ্নিমিত্র'

(২) 'বিদ্যাসুন্দর', 'রুক্মিণী-হরণ' ও 'মালতীমাধব'

(৩) 'মালতীমাধব'

তখন সখের অভিনয়ে সৌখীনরা যোগ দিতেন। সাতুবাবুর বাড়ীতে যে অভিনয় হয়, সে সম্বন্ধে মহেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন—"সাতুবাবুর নাতি শরৎবাবু শকুন্তলা সাজিয়াছিলেন। যখন ষ্টেজের উপরে বিশ হাজার টাকার অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া শরৎবাবু দীপ্তিময়ী শকুন্তলার রাণীবেশ দেখাইয়াছিলেন, তখন দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইয়াছিল।"

আর 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের অভিনয়ে (রাজা) সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কঞ্চুকী সাজিয়াছিলেন। তখন ফিনান্স আফিসের প্রসিদ্ধ চাকরীয়া দীননাথ ঘোষ ষ্টেজ ম্যানেজার, ঐ আফিসের কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদূষক।

মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক এই কেশবচন্দ্রকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন:—

"আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আপনি আধুনিক বঙ্গদেশীয় নটকুলশিরোমণি; ইহার দোষগুণ আপনার কাছে কিছুই অবিদিত থাকিবেক না। বিশেষতঃ আমার এই বাঞ্ছা যে, ভবিষ্যতে এদেশীয় পণ্ডিত সম্প্রদায় জানিতে পারেন যে, আপনার সদৃশ দর্শন-কাব্যবিশারদ একজন মহোদয় ব্যক্তি মাদৃশজনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ প্রকাশ করেন।"

'ভদ্রার্জ্জুন' নাটকের আলোচনা-প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন :—

"তারাচরণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, শুধু নাটকের অভাবে নয়, উপযুক্ত দর্শকের অভাবেও বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চ তখন পর্য্যন্তও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। শেষ কারণে লেখকের উদ্দেশ্যও সফল হয় নাই। 'ভদ্রার্জ্জুন' আদৌ অভিনীত হইয়াছিল কি না জানা নাই। পাঠক-সমাজেও বইটির আদর হয় নাই।"

সে সময় ইংরেজী শিক্ষার প্লাবন বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজ প্লাবিত করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যান্ত বাঙ্গালা লেখকগণ বাঙ্গালা ভাষার অনাদরের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। 'বঙ্গদর্শনে'র "পত্রসূচনা"য় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

"যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ। ইংরেজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। * * * * সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুল জবাব কেন দিব ?"

তাহার পর :—

"লেখাপড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্যসম্প্রদায়ের কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেকচার, এড্রেস, প্রোসিডিংস, সমুদায় ইংরাজিতে হয়। যদি কখন উভয় পক্ষই ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতে হয় ; কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র-লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির কিছু

জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদিও ইংরাজিতে পঠিত হইবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকরহস্যে'—"বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর" ব্যঙ্গ-রচনায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ঘৃণাপোষণকারী বাঙ্গালী-দিগকে যে কশাঘাত করিয়াছেন, তাহা উপভোগ্য, সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ সে সময়ের ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথায় লিখিয়াছেন :—

"বাঙ্গালাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি পণ্ডিতেরা তাহাকে বর্ব্বর জ্ঞান করিতেন। বাঙ্গালা ভাষায় যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করা যাইতে পারে সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। সেইজন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকদের জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্য-পুস্তক রচনা করিতেন।"

অবশ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ব্যতিক্রম—নিয়ম নহেন। রাজ-নারায়ণ লিখিয়াছিলেন :—

"জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির প্রতি জাতীয় উন্নতি বিলক্ষণ নির্ভর করে। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন আবার জাতীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতীত কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না।"

তিনি বলিয়াছিলেন—"এ দেশে পঞ্চবিংশতি বৎসরাবধি যে ইংরাজী ভাষার অনুশীলনা যত্নের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে কি ফল লব্ধ হইল ?"

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যদি বা শিক্ষার বিস্তার হইতেছিল, তথাপি সামাজিক প্রথা এত প্রবল ছিল যে, তাঁহাদিগকে রুদ্ধদ্বার পাল্কীতে গঙ্গায় চুবাইয়া গঙ্গাস্নানের পুণ্যার্জ্জন করান হইত। ধনীর গৃহিণীরা যে পাল্কীতে যাইতেন, তাহার আবার আবরণ—ঘেরাটোপ থাকিত।

আমরা যেমন ইহা দেখিয়াছি, তেমনই দেখিয়াছি, কলিকাতার উপকণ্ঠে সুখচর গ্রামে কলিকাতার ইংরেজের চাকরীতে ধনশালী কোন পরিবারের গঙ্গাতীরস্থ গৃহে যে সোপানশ্রেণী গঙ্গাগর্ভে নামিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যভাগে—যে স্থানে জোয়ারের সময় জল উঠে তথায়—একটি কক্ষ আছে ; জল তাহাতে প্রবেশ করিলে পরিবারের মহিলারা তথায় যাইয়া স্নান করিতেন—তাঁহারা অসূর্য্যম্পশ্যা না হইলেও লোকদৃষ্টির বিষয় হইতে পারেন না। খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমেও দেখা গিয়াছে, কোন কোন পরিবারের মহিলারা হয় পাল্কীতে যাইয়া ট্রেনে উঠিতেন, নহেত মশারির মধ্যে তাঁহাদিগকে প্ল্যাটফর্ম্ম অতিক্রম করিতে হইত। বলা বাহুল্য, তাহাতেই তাঁহাদিগের প্রতি লোকের দৃষ্টি অধিক আকৃষ্ট হইত।

সুতরাং পূর্ব্বে যদি পেশাদারী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলেও ভদ্রমহিলাদিগের অভিনয়-দর্শনার্থ তথায় গমনের সম্ভাবনা থাকিত না। অথচ তাঁহারাই বাঙ্গালানাটকাভিনয়ের আদর করিবেন—এমন সম্ভাবনা ছিল। সেইজন্য রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করিলেও তাহাতে দর্শকের অভাব ও দর্শকের অভাবে অর্থাগম-বিঘ্নের আশঙ্কা ছিল।

কিন্তু এই মহিলারাই মাতৃভাষার আদর করিতেন এবং তাঁহাদিগের আদর বাঙ্গালা সাহিত্যের সকল বিভাগ পুষ্ট ও শ্রীসম্পন্ন করিতে অসাধারণ সাহায্য করিয়াছিল। সেইজন্যই ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন :—

"Even now you will hear Anglicized Bengalis tell you with a sort of triumph that the only people who read Bengali books are the Bengali ladies. The sneer is a little out of date, but a few years ago it would not have been so utterly beside the mark. All honour then to the women of Bengal, whose cultural appreciation kept Bengali literature alive. All honour to the noble

few who with only the women of Bengal and a small class of cultured men to appreciate their efforts adhered to the language our forefathers spoke, and did not sell themselves to the tongue of the foreigner. Their reward is the heart-felt gratitude of a nation and an immortal renown."

অরবিন্দই বলিয়াছিলেন—"What Bengal thinks to-morrow, India will be thinking tomorrow week."

মধুসূদন ও দীনবন্ধু

মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্যিক প্রতিভা অসাধারণ। সেই অসাধারণ প্রতিভা সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক, ইটালিয়ান প্রভৃতি বহু সাহিত্যের চর্চ্চায় বিশেষ সমুজ্জ্বল হইয়াছিল—"আরোপ্য চক্রভ্রম-মুক্ততেজাস্ত্বষ্ট্রেব যত্নোল্লিখিতো বিভাতি।" আবার তাঁহার কল্পনা "স্বর্গ মর্ত্ত ধরাতলে প্রচণ্ডজলধিতলে"—সর্ব্বত্র অবারিতগতি। তিনি তাঁহার শ্যামা জন্মভূমির নিকট সার্থক প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন—

"ফুটি যেন স্মৃতিজলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস—কি বসন্ত, কি শরদে।"

গোল্ডস্মিথের সম্বন্ধে জন্‌শন যাহা লিখিয়াছিলেন, মধুসূদনের সম্বন্ধে আমরা তাহাই বলিতে পারি—

"Who left scarcely any style of writing untouched,
And touched nothing that he did not adorn,"

শ্রীকৃষ্ণের মুখমারুতে পূর্ণ হইয়া কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্য শঙ্খ যেরূপ গর্জ্জন করিয়াছিল 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে তাঁহার রচনার গর্জ্জন সেইরূপ গভীর ও গম্ভীর। আবার তিনিই 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে "মুরারি-মুরলী-ধ্বনি"তে লিখিয়াছিলেন :—

নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকা-রমণ !
চল, সখি, ত্বরা করি দেখিগে প্রাণের হরি
ব্রজের রতন।"

কাব্যের সকল বিভাগে তাঁহার ভাবের ঝঙ্কার, ভাষার টঙ্কার, উপমার অলঙ্কার বিস্ময়কর। ভগীরথ যেমন সাধনা করিয়া গঙ্গাকে মর্ত্তে আনিয়া সগর-সন্তানগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, মধুসূদন তেমনই সাধনার দ্বারা বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যে নূতন জীবন-সঞ্চার করিয়াছিলেন।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের উত্তরাধিকারীরা 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ) গ্রন্থকার রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় তাঁহাদিগের বেলগাছিয়ার বাগান বাড়ীতে সাড়ম্বরে করাইয়াছিলেন। তখন এইরূপ অনুষ্ঠানে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ ইংরেজদিগকে নিমন্ত্রণ করা রীতি হইয়া উঠিয়াছিল। যাহাতে বিদেশী দর্শকগণ অভিনয় অনুসরণ করিতে পারেন, সেই জন্য মধুসূদনকে নাটকখানির ইংরেজী অনুবাদ করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। সেই অভিনয় দেখিয়া—হয়ত বা অনুবাদ করিবার জন্য নাটকখানি মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়া—মধুসূদন বাঙ্গালায় প্রকৃত উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিতে অনুপ্রাণিত হইয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' রচনা করেন। পরবৎসর তাঁহার 'পদ্মাবতী নাটক' প্রকাশিত হয় এবং তাহারই মধ্যবর্ত্তীকালে তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড়শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনদ্বয় রচিত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তৃতীয় ও শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' প্রকাশিত হয়।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের "মঙ্গলাচরণে" তিনি কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেন :—

"এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্য রচনা পরিত্যাগ করিয়াছি। অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও এদেশে এতদূর পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই যে, তাহা সাহস পূর্ব্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি। তথাচ ইহাও বক্তব্য যে, আমাদিগের এ দেশীয়

মাতৃভাষায় রঙ্গভূমিতে গদ্য অতীব সুশ্রাব্য হয়—এমন কি বোধ করি, অন্য কোন ভাষায় তদ্রূপ হওয়া সুকঠিন।”

বাঙ্গালা ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাস মধুসূদনের বৈশিষ্ট্য। তিনি বিদেশে অবস্থানকালে লিখিয়াছিলেন, যখন তিনি “পরধন লোভে মত্ত” হইয়া পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করিতেছিলেন, তখন বঙ্গের কুললক্ষ্মী তাঁহাকে স্বপ্নে বলিয়া দেন:—

“ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি ?”

তখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হয়—

“পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষারূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।”

মধুসূদন ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক রচনা-কালেও নাটকে অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যবহার করিতে সাহসী হইতে পারেন নাই। সেই জন্য মনে করা অসঙ্গত নহে যে, ‘পদ্মাবতী’ নাটকে তিনি কয়টি স্থানে অমিত্রাক্ষর পয়ার ব্যবহার করিয়া যে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার ফল আশানুরূপ হয় নাই। পরীক্ষার্থ তিনি স্থানে স্থানে কথোপ-কথনে ভঙ্গ-অভঙ্গ অমিত্রাক্ষর পয়ারের ব্যবহার করিয়াছিলেন:—

শচী—প্রণাম হে দেববর, কি করেছ বল।
কলি—পালিনু তোমার আজ্ঞা যতনে, ইন্দ্রাণী,
বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে।
শচী—(ব্যগ্রভাবে)—কোথায় রেখেছ তারে ?
কলি— এই ঘোর বনে
সখীসহ আনি তারে রেখেছি, মহিষি।

অন্যত্র—

“সতত কুপথে গতি মোর।
নলিনীরে স্বজেন বিধাতা—

জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজবলে।"

তখনও মধুসূদন পয়ারের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে দ্বিধায় বিচলিত। পরবর্ত্তী কালে যাঁহারা সে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্রের নাম তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি অমিত্র ছন্দকে ধ্বনি ও বক্তব্যের গুরুত্ব অনুসারে বিভক্ত করিয়া এক নূতন প্রথার সৃষ্টি করেন।

মধুসূদন নাটকে গান বর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

মধুসূদন তাঁহার রচনায় কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেন নাই। বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে বহুদিন প্রত্যেক মুদ্রাযন্ত্রে একজন "পণ্ডিত মহাশয়" থাকিতেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ—ইংরেজী-শিক্ষিত লেখকদিগের রচনায় কোথাও যদি সংস্কৃত-ব্যাকরণ-বিরোধী পদাদি থাকিত বা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাইত, তবে তিনি সে সকল সংশোধন করিয়া দিতেন। মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক লিখিত হইলে রামনারায়ণ "পণ্ডিত মহাশয়ের" কার্য করিবার ভার পাইয়াছিলেন। রামনারায়ণ তখন 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব' প্রভৃতি নাটক রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি, বোধ হয়, মধুসূদনের রচনার পরিবর্ত্তন করিতে দুঃসাহসী হইয়াছিলেন। মধুসূদন তাহাতে সম্মত হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখিয়াছিলেন :—

"Ram Narayon's 'Version', as you justly call it, disappoints me. I have at once made up my mind to reject his aid. I shall either stand or fall by myself."

তিনি বলেন, তিনি রামনারায়ণকে রচনায় ব্যাকরণগত ভুল থাকিলে তাহা সংশোধন করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন সংশোধন গ্রহণ করিতে মধুসূদনের আপত্তি ছিল না—"but recast all my sentences—the Devil !! I would sooner burn the

thing.” রামনারায়ণ রচনার কিরূপ পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করিয়া মধুসূদনের আত্মসম্মানজ্ঞানে আঘাত করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। মনে হয়, তিনি গ্রন্থের ভাষা আমূল পরিবর্ত্তিত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন!

মধুসূদন যে রামনারায়ণের প্রস্তাবে রুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু তিনি যে উপযুক্ত সমালোচকের সমালোচনার আদর করিতেন, তাহা দেখা গিয়াছে। ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক রচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইয়া তাঁহার মত জানিতে চাহিতেন। কেশব বাবুর সমালোচনায় নাটকের কতকগুলি ত্রুটি দেখান হইয়াছিল। তাহার উত্তরে মধুসূদন যে পত্র কেশব বাবুকে লিখিয়াছিলেন, (১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ) তাহাতে বিনয়ের অভাব নাই। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ এইরূপ:—

“দীন ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক পাঠকালে আপনি যদি বিশেষরূপে সেক্সপীয়রের বিষয় বিবেচনা না করিতেন, তবে ভাল হইত। আপনি যে সকল ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকলের কতকগুলি যে ত্রুটি তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু সকলেই ত্রুটিশূন্য রচনা করিতে পারে না—সেক্সপীয়রও পারেন নাই। প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা হিসাবে আপনি অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর নাটক-সমালোচক; কিন্তু ইহা মনেও করিবেন না যে, বাঙ্গালায় নাটকখানির এই সকল গোপন ত্রুটি লক্ষ্য করিতে পারেন, এমন তিন জন লোকও আছেন।”

এই পত্রেই মধুসূদন ভাষা-সম্বন্ধে লিখেন—

“আপনি যে এই নাটকের ভাষায় প্রীত হইয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। লিখিতে লিখিতে রচনা প্রাঞ্জল হয়—আপনি জানেন, আমি নূতন ব্রতী। আশা করি, আমি ক্রমে উন্নতি লাভ করিব।”

আবার—

"Perfection, my dear fellow, can only be attained by long practice. So you must not be very severe upon poor me. If spared, perhaps, I shall yet do better!"

রাজনারায়ণ বাবু মধুসূদনকে সিংহল-বিজয় সম্বন্ধে কাব্য রচনা করিতে বলিয়াছিলেন। বাঙ্গালী কর্তৃক অন্য দেশ জয়ের কথা দেশাত্মবোধ-প্রচারক রাজনারায়ণ বাবুর পক্ষে আনন্দদায়ক ছিল। মধুসূদন তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—"আমি ঘটনাটি ভুলিয়া গিয়াছি; কোন্ পুস্তকে পাইব, তাহাও জানি না; তাহা আমাকে জানাইয়া দিবেন।"

তিনি কেশব বাবুকে ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে হাস্যরস সঞ্চার করিতে দিতেও প্রস্তুত ছিলেন।

ডক্টর সুকুমার সেন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"ইতিহাস হইতে আখ্যানবস্তু গ্রহণ করিয়া লেখা বাঙ্গালা নাট্য-রচনার মধ্যে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক প্রথম। মধুসূদন নাটকটির বিষয়-বস্তু সাক্ষাৎ ভাবে টডের রাজস্থান হইতে গ্রহণ করেন নাই; ১৭৭৯ শকাব্দের (অর্থাৎ ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের) পৌষসংখ্যা বিবিধার্থ সংগ্রহে প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস' প্রবন্ধটি মধুসূদনের সাক্ষাৎ উপজীব্য ছিল বলিয়া মনে হয়। তবে ইতিহাসকাহিনীর সহিত নাটককাহিনীর সম্পর্ক নিতান্তই ক্ষীণ। তাই 'কৃষ্ণকুমারী' নাটককে সর্ব্বাংশে ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না।"

সত্যেন্দ্রনাথের রচনা হইতে মধুসূদন রচনার প্ররোচনা পাইয়াছিলেন কি না, বলা যায় না। দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যে ডক্টর সেন যদিও স্বীকার করিয়াছেন, সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ "মধুসূদনের সাক্ষাৎ উপজীব্য ছিল বলিয়া মনে হয়"—তথাপি

বলিয়াছেন—মধুসূদন "নাটকটির বিষয়-বস্তু সাক্ষাৎ ভাবে টডের রাজস্থান হইতে গ্রহণ করেন নাই"! মধুসূদন যে টডের গ্রন্থ পাঠ করেন নাই এবং তাহা হইতে নাটকখানির বিষয়-বস্তু গ্রহণ করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? মধুসূদন যে টডের 'রাজস্থান' দেখিতে ত্রুটি করেন নাই, তাহা তাঁহার লিখিত পত্রে বুঝিতে পারা যায়। বাস্তবিক টডের 'রাজস্থান' বাঙ্গালায় বিশেষ আদরলাভ করিয়াছিল। উহা বাঙ্গালায় দুইবার অনূদিত হয়; প্রথম অনুবাদ করান—বরদাকান্ত মিত্র, দ্বিতীয় বরাট প্রেসের অধিকারী অঘোরনাথ বরাট—এই অনুবাদ যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় করিয়াছিলেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' ও 'কর্ম্মদেবী'—কাব্যদ্বয় রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত।

নাটকে ইতিহাসের অনুসরণ কতটুকু হইতে পারে, তাহা বলা যায় না—কারণ, তাহাতে কল্পনারঞ্জন অনিবার্য্য। সেক্সপীয়রের ইংলণ্ড-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে ডাউডেন লিখিয়াছেন :—

"The characters in the historical plays are conceived chiefly with reference to action......In the great tragedies we are concerned more with what man *is* than with what he *does*."

মধুসূদনের লিখিত পত্রে দেখা যায়, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক যাহাতে অভিনীত হয়, সে জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। কিন্তু তাঁহার আগ্রহ পূর্ণ হয় নাই। ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া তিনি আর অনেক দিন নাটক রচনা করেন নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে ইহা দুর্ভাগ্য।

এই সময়ে মুসলমান পাত্রপাত্রী লইয়া একখানি নাটক রচনা করিবার অভিপ্রায় মধুসূদনের ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন—মুসলমানরা হিন্দুদিগের তুলনায় অধিক উগ্র এবং সেইজন্য মুসলমান পাত্রপাত্রীতে রিপুপ্রভাব প্রদর্শনের অধিক সুবিধা হইবে। তিনি

রিজিয়াকে কেন্দ্র করিয়া একখানি নাটক রচনা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু বেলগাছিয়ায় বা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রঙ্গমঞ্চে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনীত না হওয়ায় তিনি আর নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই।

তিনি আবার বাঙ্গালা নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তখন তিনি—হেমচন্দ্রের ভাষায়—

"ক্ষিপ্তগ্রহপ্রায় ধরাতে আসিয়া
জ্বলিয়া হইলা শেষ।"

'মায়া-কানন' নাটকের প্রকাশক শরচ্চন্দ্র ঘোষ ও অখিলনাথ চট্টোপাধ্যায় উহার "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছিলেন :—

"বঙ্গকবিশিরোমণি ও সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত পীড়িত শয্যায় শয়ন করিয়া 'মায়া-কানন' নামে এই নাটকখানি রচনা করেন। বঙ্গ-রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে আমরাই তাঁহাকে দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তদনুসারে তিনি 'মায়া-কানন' নামে এই নাটক ও 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে আর একখানি নাটকের কতক অংশ রচনা করেন। লেখা সমাপ্ত হইবার অগ্রে তাঁহাকে উপযুক্ত মূল্য দিয়া এবং পীড়াকালীন সাহায্যদান করিয়া আমরা উভয়ে ঐ দুই নাটকের অধিকারিত্ব-স্বত্ব এবং বঙ্গ-রঙ্গভূমে অভিনয়ের অধিকার ক্রয় করিয়াছি। * * * 'মায়া-কানন' বিয়োগান্ত নাটক। ইহার অন্তর্গত করুণ রস পাঠ করিয়া কোনক্রমে অশ্রু সংবরণ করা যায় না।"

যে রোগশয্যা তাঁহার মৃত্যুশয্যা হইয়াছিল, সেই রোগশয্যায় অর্থাভাবহেতু মধুসূদন 'মায়া-কানন' রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকের বা 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ঔজ্জ্বল্য না থাকিলেও ইহা মধুসূদনের অসাধারণ প্রতিভার স্পর্শে মনোরম হইয়াছে। ইহা গদ্যে লিখিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, 'পদ্মাবতী' নাটকে মধুসূদন

অমিত্রাক্ষর পয়ারাদি—পরীক্ষা হিসাবে—অতি অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের "মঙ্গলাচরণে" বলিয়াছিলেন, অমিত্রাক্ষর পদ্য দেশে বিশেষরূপ প্রচলিত না হওয়ায় তাহা ব্যবহার করিতে সাহস করেন নাই। অমিত্রাক্ষরে তাঁহার যশঃ অতুলনীয়। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন সিংহ এই ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাহাতে পয়ারের নিয়মও লঙ্ঘন করিয়াছিলেন।—

"হে সজ্জন, স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রহস্য রসের রঙ্গে
চিত্রিনু চরিত্র—দেবী সরস্বতী-বরে।
কৃপাচক্ষে হের একবার ; পরে বিবেচনা মতে
যার যা অধিক আছে 'তিরস্কার' কিম্বা 'পুরস্কার'
দিও তাহা মোরে—বহুমানে লব শির পাতি।"

মধুসূদনের দেশাত্মবোধ রাজনীতিক আন্দোলনে আত্মপ্রকাশ করে নাই বটে, কিন্তু তাঁহার রচনায় তাহার স্ফূর্ত্তি সুস্পষ্ট। 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে তিনি "ভারতভূমি" কবিতায় আক্ষেপ করিয়াছিলেন :—

"কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনী,
চন্দন হইল বিষ,—সুধা তিত অতি ?"

আর "সমাপ্তেতে" তিনি দেশমাতৃকার চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন—

"এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে।"

তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ভীম সিংহের খেদোক্তি বহুদিন এ দেশের গগন-পবন মুখরিত করিয়াছিল :—

"ভগবতি, এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে ! এ দেশের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্তসকল স্মরণ হলে, আমরা যে মানুষ কোন মতেই

এ বিশ্বাস হয় না জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকুল হলেন, তা বল্‌তে পারি নে। হায়! হায়! যেমন কোন লবণাম্বু-তরঙ্গ কোন সুমিস্টবারি নদীতে প্রবেশ ক'রে তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্ব্বনাশ করেছে। ভগবতি, আমরা কি আর এ অপমান হতে কখনও অব্যাহতি পাবো?"

একদিন চিতোরের প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠে অশরীরী বাণী যেমন ধ্বনিত হইত—"ম্যঁয় ভুখা হো"—তেমনই এই আক্ষেপ বহুকাল এ দেশে ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

মধুসূদন যে দুইখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন – সে দুইখানিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে সম্প্রদায় ইংরেজী শিখিয়া—বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহাদিগের কথায় বলিয়াছেন, তাঁহারা "ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়েৎ বিলাতী কুক্কুর সকলেরই সেবা করেন"—তাঁহাদিগের দল পুষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের স্বরূপ 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে এবং যে রক্ষণশীল হিন্দুরা আচারের আবরণে ভণ্ডামী ও দুর্নীতি গোপন রাখিতেন 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে তাঁহাদিগের স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল। শেষোক্তদিগের বর্ণনা:—

"বাহিরে ছিল সাধুর আকার, মনটা কিন্তু ধর্ম্মধোয়া।
পুণ্য-খাতায় জমা শূন্য, ভণ্ডামীতে চারটি পোয়া॥'

তাহাদিগের প্রতীককেই—

"শিক্ষা দিলে কিলের চোটে, হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম্ম ফল্‌লো ধর্ম্ম, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া॥"

প্রথম প্রহসনের প্রতিপাদ্য কি, তাহা পুস্তক-শেষে হরকামিনীর উক্তিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে:—

"বেহায়ারা আবার বলে কি যে, আমরা সায়েবদের মতন সভ্য হয়েছি। হা, আমার পোড়াকপাল! মদমাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?—একেই কি বলে সভ্যতা?"

য়ুরোপীয় সভ্যতা যে স্বেচ্ছাচারিতা নহে—সভ্যতার যে দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ তাহা না বুঝিলে সমাজের অনিষ্ট অনিবার্য্য—তাহাই মধুসূদন বুঝাইয়াছেন।

ডক্টর সুকুমার সেনের অনুমান :—

"'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' লিখিয়া মধুসূদন সেকালের কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সম্প্রদায়কে চটাইয়াছিলেন। সেইজন্য এই চমৎকার প্রহসনটি যথোপযুক্ত আদর পায় নাই। যাঁহারা 'একেই কি বলে সভ্যতা' পড়িয়া বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্লানিচিত্রে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন নিজেদের নিখুঁত ছবি দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন। নব্যতন্ত্রী ও প্রাচীনপন্থী দুই দলকেই ঘাঁটাইবার ফলে প্রহসন দুইখানি বহুদিন যাবৎ অভিনীত হইতে পারিল না।"

এই প্রহসনদ্বয় যে কেবল সমাজের দুষ্ট ক্ষত প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল, তাহাই নহে; ইহাদিগের ভাষা সরল, সহজ ও সরস। মধুসূদনের নাটক কয়খানিতে যে ভাষা সরল হইয়া আসিয়াছিল, প্রহসনদ্বয়ে তাহার সরলতার সঙ্গে সরসতা সংযুক্ত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত-ব্যবসায়ীদিগের যে বাঙ্গালা ভাষার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—সেই ভাষা "প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল", তাহা কিরূপ ছিল, তাহা আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'প্রথম ভাগে'র পূর্ব্ববর্ত্তী 'শিশুবোধকে' পত্র লিখিবার ধারা শিক্ষায়—"সাবিত্রী-ধর্ম্মাশ্রিতা"—"গুণাধিকা স্বধর্ম্মপরিপালিকা শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবীর"—"ধনাভিলাষে পরদেশে" অবস্থানকারী স্বামী—"ঐহিক-পারত্রিক-নিস্তার কর্ত্তৃক ভবার্ণবনাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্যকে" লিখিত পত্রে পাই।

যে বৎসর 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক প্রকাশিত হয়, সেই বৎসরেই কালী-প্রসন্ন সিংহের 'মালতী-মাধব' (ভবভূতির প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক

অবলম্বনে লিখিত) প্রকাশিত হয়। তাহার ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছিলেন :—

"মদ্রচিত মৎপ্রণীত ও মদনুমোদিত অন্যান্য নাটক হইতে 'মালতী-মাধবে'র ভাষারও প্রভেদ হইয়াছে, কারণ অভিনয়ার্হ নাটক-সকল ইদানীন্তন যে ভাষায় লিখিত হইতেছে আমিও সেই রূপ অবলম্বন করিয়া ঈপ্সিত বিষয় সুসিদ্ধকরণ-মানসে সচেষ্ট ছিলাম।"

মধুসূদনের ভাষার আদর্শ এইরূপে গৃহীত হইয়াছিল।

নাটক যাহাতে অভিনীত হয়, সে বিষয়ে মধুসূদনের কিরূপ আগ্রহ ছিল, তাহা 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র গঙ্গো-পাধ্যায়কে লিখিত তাঁহার পত্রে বুঝিতে পারা যায়। সেই পত্রে তাঁহার রচিত প্রহসনদ্বয় অভিনীত না হওয়ায় তাঁহার মনোবেদনা অভিব্যক্ত হইয়াছিল। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক সিংহদিগের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে অভিনীত হয়, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। তিনি কেশব বাবুকে সেই ব্যবস্থা করিতে অনুরোধান্তে লিখেন :—

"মনে রাখিবেন, আপনারা পূর্ব্বে প্রহসনদ্বয় সম্বন্ধে আমার পক্ষভঙ্গ করিয়াছিলেন। এ বারও যদি আপনারা সেইরূপ করেন, তবে আমি বাঙ্গালা ভাষা বর্জ্জন করিয়া হিব্রু বা চীনা ভাষায় রচনা করিব।"

'মধুস্মৃতি'তে এই পত্রখানি গ্রন্থকার নগেন্দ্রনাথ সোম মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন।

তখনও বাঙ্গালায় পেশাদারী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেইজন্য কেহ নাটক রচনা করিলে তাহার অভিনয়ের জন্য অভিনয়ামোদী কলিকাতার কয়জন ধনীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইত।

পেশাদারী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি। তখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকের বিশেষ আদর হইয়াছে। মনোমোহন থিয়েটারের অধিকারী

মনোমোহন পাঁড়ে তাঁহার একখানি নাটক অভিনয়ার্থ পাইতে চাহেন। অধিকারীকে সেজন্য প্রথমে কত টাকা দিতে হইবে, তাহা স্থির হয়। নাটক তখন লিখিত হইতেছিল। নাটক রচনা শেষ হইলে দ্বিজেন্দ্রলাল অধিকারী মহাশয়কে সংবাদ দিলেন এবং তিনি নাটক-পাঠ শুনিবার জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহে আসিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাকে চুক্তি অনুসারে দেয় টাকার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলেন। মনোমোহন বাবু নির্দ্ধারিত টাকা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি প্রস্থান করিলেন এবং অল্প সময় পরে নির্দ্ধারিত টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহা দ্বিজেন্দ্রলালকে দিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক পড়িয়া শুনাইলেন। রঙ্গালয়ের অধিকারী জানিতেন, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক অভিনীত হইলে তিনি লাভবান হইবেন; দ্বিজেন্দ্রলাল জানিতেন, অধিকারীর নিকট হইতে তিনি রচনার মূল্য পাইবেন। রঙ্গালয়ের এই ব্যবসায়িক দিক মধুসূদনের সময় গঠিত হয় নাই। কারণ, তখনও পেশাদারী রঙ্গালয় ছিল না।

মধুসূদন বাঙ্গালা নাটক—প্রকৃত বাঙ্গালা নাটক—প্রথম রচিত করেন, সেজন্য ভাষাকে প্রয়োজনের উপযোগী করেন এবং বাঙ্গালায় প্রকৃত নাটকের আদর্শ-প্রতিষ্ঠা করেন—যেন তিনি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নিপুণ শিল্পীর মত প্রতিমা-গঠন করিয়াছিলেন এবং তাহার পরে সেই প্রতিমা শ্রদ্ধার গঙ্গোদকে বিধৌত রত্নবেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া—ভক্তির পঞ্চপ্রদীপে তাহার আরতি করিয়াছিলেন এবং আপনার নিষ্ঠায় তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রধানদিগের মধ্যে মধুসূদনের পরেই দীনবন্ধু মিত্রের নামোল্লেখ করিতে হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের মৃত্যু হয়; ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ যে বৎসর মধুসূদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' রচিত হয়, সেই বৎসরেই দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণং নাম নাটকম্' ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে দীনবন্ধুর নাম ছিল না; লিখিত ছিল—"নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি-

প্রণীতম্।" কেন যে ইহাতে গ্রন্থকারের নাম ছিল না, তাহা নাটকখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল ঘটনা ঘটে, সেই সকল হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক ও দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'—এই দুইখানি নাটক প্রকাশের মধ্যে বাঙ্গালায় অনেকগুলি নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল। রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অনুকরণে যেমন, মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকের অনুকরণেও তেমনই বহু নাটক প্রকাশিত হয়। সে সকলের দীর্ঘ তালিকা প্রদানের কোন প্রয়োজন নাই। সেগুলি যে আজ বিস্মৃতির অতলতলে তাহাদিগের উপযুক্ত স্থান লাভ করিয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, তাহাদিগের অসারতাই তাহাদিগের অনাদরের কারণ। বিশেষ— Imitation may be the best form of flattery, but it is the most dangerous form of admiration.

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' যে কার্য্য করিয়াছে, নবযুগের ইতিহাসে কেবল মিসেস স্টো-র 'টমকাকার কুটীর' সেইরূপ কার্য্য করিয়াছে। ডিকেন্সের উপন্যাসগুলিও দুর্নীতি ও কদাচার নিবারণে সেরূপ সাফল্যলাভ করে নাই। স্টো-লিখিত উপন্যাস আমেরিকায় ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে লোকমত উদ্রিক্ত করিয়া যেরূপ কার্য্য করিয়াছিল, দীনবন্ধুর নাটক এই প্রদেশে নীলকরদিগের অত্যাচার-দূরীকরণে সেইরূপ কার্য্য করিয়াছিল। গঙ্গাচরণ বাবু লিখিয়াছেন— "এই গ্রন্থের খ্যাতি কেবল কবিত্বগুণে নহে, লং সাহেবের কারাবাস বশতও হইয়াছে।" লং মধুসূদনের দ্বারা এই নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই 'অপরাধে' তাঁহার অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড দেশব্যাপী আন্দোলনের পরোক্ষ কারণ— প্রত্যক্ষ কারণ 'নীলদর্পণ'; আর সেই আন্দোলনের মুখ্য ফল নীলকরের অত্যাচার-নিবারণ হইলেও তাহার গৌণ ফল—পরাধীন দেশে গণ-আন্দোলন ও গণশক্তির পুষ্টিসাধন।

এ দেশে ও বিদেশে পাটের চাহিদা বৃদ্ধির এবং জার্ম্মানীতে কৃত্রিম নীলবর্ণের উপকরণ উৎপাদনের পূর্ব্বে বাঙ্গালা হইতে রপ্তানী পণ্যের মধ্যে নীলই প্রধান ছিল। ১৮৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় ৪০ হাজার ৭ শত ৬৩ মণ নীল প্রস্তুত হয়—উহা কৃষিজ পণ্যের শতকরা ৩৮ ভাগেরও কিছু অধিক। জিলা ভাগ করিলে দেখা যায়, উৎপন্ন নীলের হিসাব এইরূপ :—

	মণ
রাজসাহী	৩,৫১২
মালদহ	২,৭৭৭
মুর্শিদাবাদ	৪,৯১২
নদীয়া	৮,০২৩
যশোহর	৮,৬৩৫
ফরিদপুর	১,৪৮৮

নীলকর য়ুরোপীয়গণ কিরূপ রাজোচিত ভাবে এ দেশে বাস করিতেন, তাহা আমরা গ্রাণ্ট প্রণীত Rural Life in Bengal নামক মনোজ্ঞ পুস্তক হইতে জানিতে পারি। এই নীলকরদিগের প্রতাপ যেমন অসাধারণ ছিল, অত্যাচারের তেমনই অন্ত ছিল না। দীনবন্ধু সেই অত্যাচারের স্বরূপ 'নীলদর্পণে' দেখাইয়াছেন। তাহাতে যে সম্প্রদায়ের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছিল, সে সম্প্রদায় এ দেশের শাসক সম্প্রদায়ের স্বজাতি।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"'নীলদর্পণ' য়ুরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত ও পঠিত হইয়াছিল। এই সৌভাগ্য বাঙ্গালায় আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য যতই হউক, কিন্তু যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লং সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন; সীটনকার অপদস্থ

হইয়াছিলেন। * ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি, শেষে তাঁহার জীবন-নির্ব্বাহের উপায় সুপ্রিম কোর্টের চাকরী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা নিজে কারাবদ্ধ কি কর্ম্মচ্যুত হয়েন নাই বটে, কিন্তু তিনি ততোঽধিক বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। এক দিন রাত্রে 'নীলদর্পণ' লিখিতে লিখিতে দীনবন্ধু মেঘনা পার হইতেছিলেন। কূল হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে গেলে নৌকা হঠাৎ জলমগ্ন হইতে লাগিল। দাঁড়ী-মাঝী সকলেই সন্তরণ আরম্ভ করিল; দীনবন্ধু তাহাতে অক্ষম, দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ' হস্তে করিয়া জলমজ্জনোম্মুখ নৌকায় বসিয়া রহিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একজন সন্তরণকারীর পদ মৃত্তিকা স্পর্শ করায় সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, 'ভয় নাই, এখানে জল অল্প, নিকটে অবশ্য চর আছে।' বাস্তব নিকটে চর ছিল, তথায় নৌকা আনীত হইয়া চরলগ্ন হইলে দীনবন্ধু উঠিয়া নৌকার ছাদের উপর বসিয়া রহিলেন। তখনও সেই আর্দ্র 'নীলদর্পণ' তাঁহার হস্তে রহিয়াছে।"

ভাগ্যক্রমে জোয়ার আসিবার পূর্ব্বে দূরে দাঁড়ের শব্দ শুনা যায়—একখানি নৌকা যাইতেছিল। ডাকিলে সেই নৌকার আরোহীরা আসিয়া দীনবন্ধু প্রভৃতির উদ্ধার সাধন করে।

১৩০৮ বঙ্গাব্দে দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'সাহিত্য' পত্রে "বঙ্গে নীল" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেন। সীটনকার তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে মেঘনায় দীনবন্ধুর বিপদ্‌সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন—"Perhaps বরুণ দেবতা saved him."

'নীলদর্পণে'র ভূমিকায় দীনবন্ধু নীলকরদিগকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

---

* ইনি সরকারী কর্ম্মচারী হইয়াও ইংরেজীতে অনূদিত 'নীলদর্পণ' ডাকে প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

"তোমরা এক্ষণে দশমুদ্রা-ব্যয়ে শত মুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছ, তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে, তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ; কেবল ধনলোভপরতন্ত্র হইয়া প্রকাশ করণে অনিচ্ছুক। * * দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর লোক যেমত বিবেচনা করুক, তোমাদের মনে কখনই আনন্দ জন্মিতে পারে না; যেহেতু তোমরা তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণ শক্তি! ত্রিংশৎ মুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক মহাত্মা যীজসকে করাল পাইলেট-করে অর্পণ করিয়াছিলেন, সম্পাদক-যুগল সহস্রমুদ্রালোভ-পরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে আশ্চর্য্য কি?"

এইরূপ স্পষ্টোক্তিতে যে নীলকরগণ ও ইংরেজী সংবাদপত্রদ্বয়ের পরিচালকরা উগ্র হইয়া উঠিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

কিন্তু 'নীলদর্পণ' যে উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এরূপ সাফল্য সচরাচর হয় না।

লং 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী ভূমিকায় বলিয়াছিলেন, ইহাতে দেখান হইয়াছে "arbitrary power debases the lord as well as the peasant"। ইয়ং আয়ার্লণ্ডের ভূম্যধিকারী ও কৃষকসম্প্রদায়ের কথায় ইহাই বলিয়াছেন।

ফ্রেজার তাঁহার ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে 'নীলদর্পণ'সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন—ইহাতে "tragedy is piled on tragedy" —বিষাদময় ঘটনা পুঞ্জীভূত করা হইয়াছে। বোধ হয়, প্রয়োজন ছিল বলিয়াই দীনবন্ধু তাহা করিয়াছিলেন।

এক দিকে 'নীলদর্পণ', আর এক দিকে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ—প্রজাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিল।

তাহারা প্রথম সত্যাগ্রহ করিয়া নীল বপন করিতে অস্বীকার করে।

তখন "ধীরাজে"র গান—

"নীল-বাঁদরে সোণার বাংলা কল্লে এবার ছারে খার।
অসময়ে হারিশ ম'ল, লং এর হ'ল কারাগার।
প্রজার আর প্রাণ বাঁচান ভার।
* * * *
যত উনপাজুরের রাজত্ব হ'ল, সাধুর পক্ষে গঙ্গাপার।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—দীনবন্ধুর "অলৌকিক এবং তীব্র সহানুভূতির ফলেই তাঁহার প্রথম নাটক প্রণয়ন", " 'নীলদর্পণে' গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণ মাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়াই 'নীলদর্পণ' তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন :—

"কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। তাহা ছাড়িয়া সমাজ-সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়। কিন্তু 'নীলদর্পণে'র মুখ্য উদ্দেশ্য এবম্বিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট। তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে।"

দীনবন্ধু সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের আর দুইটি মন্তব্য তাঁহার নাটক-সমালোচকদিগের পক্ষে প্রয়োজন :—

(১) "তাঁহার সহানুভূতি তাঁহার অধীন বা আয়ত্ত নহে; তিনিই নিজে সহানুভূতির অধীন। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি তাঁহাকে যখন যে পথে লইয়া যাইত, তখন তাহাই করিতে বাধ্য হইতেন।"

(২) "দীনবন্ধুকে রাজকার্য্যানুরোধে, মণিপুর হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত, দার্জিলিং হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কেবল পথ ভ্রমণ বা নগর দর্শন নহে, ডাকঘর দেখিবার

জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত। লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁর অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহ্লাদ করিয়া সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লোকের কন্যা, আদুরীর মত গ্রাম্য বর্ষীয়সী, তোরাবের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নশীরাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে নিমচাঁদের মত সহুরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত নগরবিহারী গ্রাম্য বাবু, কাঞ্চনের মত মনুষ্য-শোণিত-পায়িনী নগরবাসিনী রাক্ষসী, নদেরচাঁদ হেমচাঁদের মত 'উনপাজুরে বরাখুরে' হাপ-পাড়াগেঁয়ে হাপ-সহুরে বয়াটে ছেলে, ঘটিরামের মত ডেপুটি, নীলকুঠির দেওয়ান, আমীন, তাগাদাগীর, উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পেঁচোর মা কাওরাণীর মত লোকের পর্য্যন্ত তিনি নাড়ী-নক্ষত্র জানিতেন। তাহারা কি করে, কি বলে, তাহা ঠিক জানিতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন,—আর কোন বাঙ্গালী লেখক তেমন পারে নাই। তাঁহার আদুরীর মত অনেক আদুরী আমি দেখিয়াছি,—তাহারা ঠিক আদুরী। নদেরচাঁদ হেমচাঁদ আমি দেখিয়াছি—তাহারা ঠিক নদেরচাঁদ বা হেমচাঁদ। মল্লিকা দেখা গিয়াছে—ঠিক অমনি ফুটন্ত মল্লিকা। দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রগুলি গঠিতেন। * * * এটুকু গেল তাঁহার Realism, তাহার উপর idealize করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া, আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের গুণ চাপাইয়া দিতেন। যেখানে যেটি সাজে, তাহা বসাইতে জানিতেন।"

দীনবন্ধু সহানুভূতির সঙ্গে কোনরূপ আপোষ বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন না। সেই জন্য তিনি যে চরিত্র অঙ্কিত করিতেন, তাহাতে দোষ বা গুণ কিছুই বাদ দিতে পারিতেন না। সেক্সপীয়র ক্যালিবন অঙ্কিত করিয়াছিলেন—তাহাকে শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ করেন নাই।

দীনবন্ধুর সৃষ্টি-কৌশল যথেষ্ট ছিল ; কিন্তু "যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না।" এ কথা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য নহে।

ইহার পরে হাস্যরসের কথা। দীনবন্ধুর নাটকে প্রচুর হাস্যরস আছে। কিন্তু তাহা বর্ত্তমান সময়ের লোকের প্রীতিপ্রদ না হইবার কারণের অভাব নাই। তাহা বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ নৈপুণ্যসহকারে বুঝাইয়া দিয়াছেন :—

"আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ-প্রণালী এক জাতীয় ছিল—এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত ; এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত, সরু লালসেটখানি বাহির করিয়া কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না ; কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরেজ-শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠিয়ালের বড় দুরবস্থা। সাহিত্য-সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে—দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে ; কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা, বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠির ভরে কাতর, শিক্ষা নাই. কোথায় মারিতে কোথায় মারে। লোক হাসায় বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং। ঈশ্বরগুপ্ত বা দীনবন্ধু এ জাতীয় লাঠিয়াল ছিলেন না। তাঁহাদের হাতে পাকা বাঁশের মোটা লাঠি, বাহুতেও অমিত বল, শিক্ষাও বিচিত্র।"

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

"নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্ব্বে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। * * * বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে হাস্যরসকে

সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। * * * যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়-শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।"

দীনবন্ধুর নাটকগুলির আলোচনা-প্রসঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যে হাস্যরসের বিষয় বিস্তৃতভাবে বিবেচনা করা স্বাভাবিক। কারণ, তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে 'নীলদর্পণ' ও 'কমলে কামিনী' ব্যতীত অবশিষ্ট কয়খানি হয় প্রহসন, নহেত সে সকলে প্রহসনের লক্ষণই অধিক।

হাস্যরসের প্রকাশ দুইভাবে হইতে পারে। ইংরেজীতে এই দুই ভাবকে wit ও humour বলা হয়। ইংরেজ কবি টেনিশনের রচনায় হাস্যরসবিকাশ সর্ব্বত্র সংযত ও নির্ম্মল। তাঁহার হাস্যরসের আলোচনা করিতে যাইয়া মর্টন লুস বলিয়াছেন :—

"Wit may be regarded as a play of fancy addressed to the intellect, whereas humour is a play of imagination addressed to the emotions; and just as imagination includes but transcends fancy, and emotion includes but transcends thought, so humour includes but transcends wit."

সেই কারণে wit অনেক স্থলে মনীষীর নির্ম্মম হাস্য, কিন্তু humour প্রতিভাশালীর অন্তর্দৃষ্টিহেতু অশ্রুর উপরেও মৃদু হাস্যের স্নিগ্ধ আলোকপাত করিতে পারে। দীনবন্ধুর রচনায় হাস্যরসবিকাশ humour; তাহার কারণ, তাঁহার সহানুভূতি সর্ব্বব্যাপী। সেই সহানুভূতি কেবল 'নীলদর্পণে' অত্যাচারপীড়িতের বেদনার উৎস হইতে উৎসারিত করুণার ধারায় প্রবাহিত হয় নাই, পরন্তু নিমচাঁদ

দত্তের মত বিশুষ্ক-জীবন বিফলীকৃতশিক্ষা নৈরাশ্যপীড়িত মগুপের দুঃখেও বিগলিত।

উইলিয়ম শ্যামুয়েল লিলী ইংলণ্ডে রয়াল ইনষ্টিটিউসানে উনবিংশ খৃষ্টাব্দের ইংরেজ হাস্যরসিকদিগের সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া চারিজন লেখকের বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন—ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ্জ ইলিয়ট ও কার্লাইল। তিনি হাস্যরস-পরিবেশক-দিগের সম্বন্ধে থ্যাকারের সংজ্ঞাই গ্রহণ করিয়াছিলেন :—

"হাস্যরস-পরিবেশক লেখক মানুষের ভালবাসা, করুণা, সমবেদনা, অসত্যের প্রতি ঘৃণা—দুর্ব্বলের, দরিদ্রের, অত্যাচারপীড়িতের ও অসুখীর প্রতি কৃপা উদ্রিক্ত করিয়া থাকেন।"

এই আদর্শে বিচার করিলে দীনবন্ধুকে বাঙ্গালা সাহিত্যে হাস্যরস-পরিবেশকদিগের মধ্যে উচ্চস্থান প্রদান করিতে হয়। বর্ত্তমান কালের রুচির মাপকাঠিতে তাঁহার নায়ক-নায়িকাদিগের রসিকতা পরীক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কথায় বঙ্কিমচন্দ্র সেইজন্য বলিয়াছেন—"আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি বিলাতি রুচির আইনে ধরা পড়িয়া ।বনা-অপরাধে অশ্লীলতা-অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন।" দীনবন্ধু যখন তাঁহার নাটকের চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন সমাজে মোটা রসিকতার আদর ছিল এবং তিনি যে সকল নায়ক-নায়িকা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাদিগের পক্ষে ঐ মোটা রসিকতার বিকাশ করাই স্বাভাবিক ছিল। সেক্সপীয়রের হ্যামলেট মাতার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রেমপাত্রীর নিকটে বসিবার জন্য যুক্তি দিয়াছিলেন—"No, good mother, here's metal more attractive." তাহার পরে হ্যামলেটের উক্তি শালীনতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। হাস্যরসবিকাশে দীনবন্ধু ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য। গুরুর মত শিষ্যও কাহাকেও বেদনা-দানের জন্য হাস্যরসের অবতারণা করিতে আগ্রহশীল ছিলেন না।

দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটক—'নবীন তপস্বিনী'। ইহা তিনি

বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন ;—লিখিয়াছিলেন—"আমার ''নবীন তপস্বিনী' প্রকৃত তপস্বিনী—বসনভূষণবিহীন—সুতরাং জনসমাজে যদি 'নবীন তপস্বিনী'র সমাদর হয়, তাহা সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের সহৃদয়তার গুণেই হইবে।"

এই নাটকে দুইটি বিভিন্ন কাহিনী রহিয়াছে। একটু মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, সে দুইটি প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার প্রবাহদ্বয়ের মত স্বতন্ত্র। ইহাতে দীনবন্ধুর জ্ঞাত সত্য ঘটনা যেমন উপকরণ যোগাইয়াছে, তেমনই সেক্সপীয়রের একখানি নাটকের প্রভাবও পতিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে অংশ প্রহসন তাহার ভাষা সরল ও লঘু—অন্য অংশগুলির ভাষা সেরূপ নহে।

'সধবার একাদশী' 'নবীন তপস্বিনী'র পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরে প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধুর তৃতীয় প্রকাশিত নাটক —'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ)। ইহা একটি প্রকৃত ঘটনাবলম্বনে লিখিত। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' সকল সমাজেই দেখা যায়—এ দেশে যেমন, বিদেশেও তেমনই। লর্ড রেডিং এ দেশে বড়লাটের কায শেষ করিয়া স্বদেশে যাইয়া, পত্নীবিয়োগ হইলে, আপনার মহিলা সেক্রেটারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত-কীর্ত্তি লয়েড জর্জ্জও বৃদ্ধবয়সে বিপত্নীক হইয়া ঐরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। এ দেশে শিক্ষিত সমাজেও এরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। নামোল্লেখে বিরত রহিলাম। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া লিখিত, তাঁহাকে আমরা দেখিয়াছি। অবশ্য নাটক-বর্ণিত ঘটনাগুলি দীনবন্ধুর কল্পনাসৃষ্ট—মূল কেবল, বৃদ্ধের বিবাহ করিতে আগ্রহ। দীনবন্ধুর আর একখানি প্রহসন—'জামাই বারিক' (১৮৭২ খৃষ্টাব্দ)। ইহা দীনবন্ধু "সদ্‌গুণরাশি" রাসবিহারী বসুকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রাসবিহারী বাবুর পৈত্রিক বাস—যশোহর জিলায় বিদ্যানন্দকাঠী গ্রামে। তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং কৃষ্ণনগরেই বাসব্যবস্থা করেন। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন

এবং তাঁহার পুরাবস্তুবিষয়ক কয়টি প্রবন্ধ এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রে প্রকাশিত হয়। 'জামাই বারিকে' সপত্নীদ্বয়ের কলহ সত্য-ঘটনাশ্রিত, ইহা বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন। কোন কোন ধনী দরিদ্র-পুত্রদিগের সহিত কন্যাদিগের বিবাহ দিয়া জামাতৃগণকে আশ্রিতবৎ গৃহে রাখিতেন—সেই কুপ্রথার দোষোদ্ঘাটনকল্পে এই প্রহসন লিখিত হয়। ইহার মত আরও কতকগুলি কুপ্রথা সে সময়ে হিন্দু-সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল। আজ হয়ত অনেকে জানেন না, কলিকাতার কোন ধনী-পরিবারে "আন্তরস" নামক কুপ্রথার আদর হইয়াছিল। সে পরিবার কায়স্থ এবং মৌলিক। কুলীনের সহিত মৌলিকের কন্যার বিবাহ দেওয়া তখন মর্য্যাদাবৃদ্ধির কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত। পুত্রগত-"কুল" কুলীনদিগের জ্যেষ্ঠপুত্র ব্যতীত অন্য পুত্রগণ মৌলিকের কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু ধনীরা কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্রে কন্যাদানই গৌরবজনক মনে করিয়া অধিকাংশস্থলে ঐ জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ যথারীতি কুলীন-কন্যার সহিত দেওয়াইয়া পরে আপন কন্যার সহিত দিতেন। জামাতা শ্বশুরের পোষ্য হইয়া থাকিতেন—তাঁহার প্রথমা পত্নী পতি-পরিত্যক্তা হইয়া পিত্রালয়ে বা কোন স্বজনের গৃহে থাকিয়া দুঃখে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেন। এইরূপ কুপ্রথা কতক অর্থনীতিক কারণে, কতক বা রুচি-পরিবর্ত্তনের ফলে ত্যক্ত হইতেছে—সমাজ আবর্জ্জনামুক্ত হইতেছে।

এই প্রহসনের "ভোঁতারাম ভাট" লইয়া কিছু আলোচনা হইয়াছে। ইহা তাঁহার রচনার বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্য রোষহেতু সৃষ্ট। কেহ কেহ বলেন—সমালোচক লালবিহারী দে। কেন যে বঙ্কিমচন্দ্র মত প্রকাশ করিয়াছেন—"কলিকাতা রিভিউতে 'সুরধুনী কাব্যে'র যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অন্যায় বোধ হয় না"—তাহা বলিতে পারি না। কারণ, 'সুরধুনী কাব্য' বর্ণনা—তাহাতে কবিপ্রতিভাবিকাশের অবসর নাই। কিন্তু ইহার পয়ার মিষ্ট।

'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের সমালোচনা (১৮৭২ খৃষ্টাব্দ) এইরূপ :—

"Babu Dina Bandhu Mitra is the author of several overpraised dramatic compositions, such as the *Nil Darpana*, *Navin Tapasvi* (?), *Sadhabar Ekadasi*, and others. The *Nil Darpana* has become a rather notorious drama in consequence of its translation into English under the auspices of the Rev. Mr. Long, and of his subsequent imprisonment ; but the play itself is a poor performance. The other plays of our author are, in our opinion, clever ; but their general fault is their coarseness. The Babu is regarded as a comical genius ; we confess, however, that his attempts at comicality oftener provoke our anger than our mirth. There is no refinement, no delicacy in our author's wit ; it is of the coarsest and broadest sort. It may excite the laughter of women, of children, of uncultivated boors, but a man of culture often turns away from it with disgust ; and if some of the plays, which we have named above, are popular to a certain extent, it only shows that the taste of the reading public in Bengal is uncultivated and rude. Babu Dina Bandhu Mitra, it appears, has left off courting the Muse of comedy and has begun wooing her more sedate sister of epic poetry ; but it would seem from the attempt before us that he is less favoured by Calliope than by Thalia. The *Suradhuni Kavya* is a poem describing the descent of the river Ganges from its sources on the 'secret top' of Himalaya, its course through the wide extended plains of Hindustan, and its fall into the Bay of Bengal. In the first part, which is before us, the Ganges or rather the Bhagirathi has been brought down from the

mountains to Triveni which is not far from Hugli; the rest of the course from Triveni to Ganga Sagara being reserved for the second and last part.

"That there are merits in the book it would be unjust to deny. The descriptions of some of the places are good; while the conception of the tributaries of the Ganges as her sisters and brothers to meet her and giving an account of their travels is really fine. There are in it, however, faults of a very grave character. In the first place the whole poem is one huge anachronism from beginning to end. The subject of the poem is the descent of the Ganges,—an event which, according to Hindu mythology, must have occurred in the remotest ages of antiquity,—and yet our poet describes the towns near which the river passes just as they are in the year of grace 1871. In the second place, the descriptions of some of the towns are very childish. In the long description of Krishnagar we are, for instance, told the name of a Bengali writer of no great reputation, and of a boy in the College who many years ago stood high in his examinations! In the third place, our poet has made a glaring mistake in geography—the Ganges is first brought down to Benares and then to Mirzapur, as if the former place was higher up the river than the latter. In the fourth place, the versification is incorrect in a great many passages,—indeed in almost every page there are some lines in which the laws of the Bengali prosody are violated. We did not expect in Babu Dina Bandhu Mitra the majestic simplicity of a Homer, the consummate art of a Virgil, or the sublimity of a Milton; but we certainly expected that before ushering into the world a volume of

poetry, he would scan his lines and see whether they are verses or not. But this he does not seem to have done."

এই সমালোচনায় damning with faint praise এর চেষ্টা থাকিলেও এখন মনে না করিয়া উপায় নাই যে, সমালোচক 'সুরধুনী কাব্য' উপলক্ষ করিয়া দীনবন্ধুর সকল রচনায় দোষারোপের চেষ্টা—অন্যায় চেষ্টাও করিয়াছেন।

দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' নাটক ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উহার উৎসর্গপত্রে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"অপরিমিত আয়াস সহকারে লীলাবতী নাটক প্রকটন করিয়াছি।" কিন্তু নাটকখানি আশানুরূপ হয় নাই। তাহার অন্যতম প্রধান কারণ, লীলাবতী-চরিত্র দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সীমাবহির্ভূত। উহা—"though within the ample range of his genius, lay outside the area of his exact knowledge." আর দেখা গিয়াছে, যে স্থানেই কোন চরিত্র তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের দাবী করিতে পারে নাই, সেই স্থানেই দীনবন্ধুর অঙ্কিত চিত্র স্বভাবানুকারী হয় নাই।

ইহা তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। তিনি কল্পনায় অভিজ্ঞতার অভাব পূর্ণ করিতে পারিতেন না বা চাহিতেন না। বিশেষ যে সময়ের সমাজের বিষয় তিনি লিখিয়াছেন, সে সময়ের সমাজে লীলাবতী আকাশ-কুসুমের মতই বিবেচিত হইত।

মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ মিত্রাক্ষর কবিতায় নাটকের স্বচ্ছন্দগতি ক্ষুণ্ণ এবং রস নষ্ট হইয়াছে।

দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' নাটকের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা তাঁহার রচিত শেষ নাটক 'কমলে কামিনী'র (১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ) উল্লেখ করিব। ইহার আখ্যানবস্তু কাছাড়ের ইতিহাসে পরিচিত কয়টি নাম অবলম্বন করিয়া রচিত। ইংরেজীতে যাহাকে romantic নাটক বলে, ইহা তাহাই। অসাধারণ ঘটনাসমাবেশের সুযোগ

ইহাতে ছিল; কিন্তু সে সুযোগের সম্যক্ সদ্ব্যবহার হয় নাই। ইহার নূতনত্বই ইহার বৈশিষ্ট্য।

এইবার আমরা দীনবন্ধুর অমর কীর্ত্তিদ্বয়ের অন্যতরের আলোচনা করিব। তাঁহার 'নীলদর্পণ' যেমন 'সধবার একাদশী'ও তেমনই অতুলনীয়। তিনি যদি কেবল এই নাটকদ্বয়ের একখানি রচনা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেই বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার কীর্ত্তি কখনও ম্লান হইত না। 'নীলদর্পণে'র বহু চরিত্র যেমন তাঁহার অভিজ্ঞতার সীমামধ্যবর্ত্তী ছিল, 'সধবার একাদশী'র প্রধান চরিত্রগুলিও তেমনই। 'সধবার একাদশী' দীনবন্ধুর সমসাময়িক ইংরেজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বরূপোদ্ঘাটন। কেহ কেহ বলেন—তাঁহার নিমচাঁদের আদর্শ—মধুসূদন দত্ত। যাঁহারা ইয়ং-বেঙ্গলের স্বরূপ দেখিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' পাঠ করিতে বলিব। তবে তাহাতে প্রদত্ত বিবরণ সম্পূর্ণ নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"যে বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' 'রহস্যসন্দর্ভে' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। * * তাহার পরবৎসর দীনবন্ধুর প্রথম গ্রন্থ 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইঁহাদের সন্ধিস্থল।"

তখন শিক্ষিত সমাজে নূতন দলের উচ্ছৃঙ্খলতা ও প্রাচীন দলের সঙ্কীর্ণতা উভয়ের সংঘাতে যে ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে সমাজে আবর্জ্জনার স্তূপ আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই সমাজ লইয়া দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' রচিত। তাহা মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের আদর্শে রচিত। তখন সমাজে যেন অমার অন্ধকার। কিন্তু তাহারই মধ্যে হিন্দুনারীর চরিত্র ধ্রুবতারার মত দীপ্তি পাইতেছিল।

'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ দত্ত যে কোন সময়ে মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে পারে। তাহার জন্যই 'সধবার একাদশী' বাঙ্গালার

শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইবে। নিমচাঁদ যে সমাজে আবির্ভূত হইয়াছিল, সে সমাজের স্বরূপ জানিতে হইলে 'সধবার একাদশী' পাঠ করিতে হইবে। ইয়ং-বেঙ্গলের সকল গুণ ও সকল দোষ নিমচাঁদকে আশ্রয় করিয়াছিল। সে মদ্যপানাসক্ত হইয়া আত্মসম্মানজ্ঞান পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু শিক্ষার গৌরব সে কখনও ভুলিতে পারে নাই এবং যে ধর্ম্মজ্ঞান মনুষ্যত্বের চিহ্ন সেই ধর্ম্মজ্ঞানভ্রষ্ট হয় নাই। নিমচাঁদ দীনবন্ধুর মত প্রতিভাশালীর দ্বারাই সৃষ্ট হইতে পারে।

বাঙ্গালার রঙ্গালয় ধর্ম্মক্ষেত্রে, সমাজক্ষেত্রে, রাজনীতিক্ষেত্রে যে কায করিয়াছে, তাহা স্মরণীয়। সেই রঙ্গালয় যে দীনবন্ধুর নাটক লইয়াই লোককে আকৃষ্ট করিতে আরম্ভ করে—আপনার গৌরব-প্রতিষ্ঠা করে, তাহা সঙ্গত। দীনবন্ধুর নাটকগুলি রচিত না হইলে বাঙ্গালীকে আরও কত দিন অভিনয়-চাতুর্য্যের জন্য ধনীর অনুগ্রহের চোরাবালুতে আশার সৌধ রচনা করিয়া হতাশ হইতে হইত, কত দিনে আবার নাট্যকারের আবির্ভাব হইত, তাহা কে বলিতে পারে?

নাট্যকারের বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে ইংরেজী সাহিত্যের ঐতিহাসিক টেন লিখিয়াছেন :—

"They see all the details, the tides that sway a man, one from without, another from within, one over another, one within another, both together without faltering and without ceasing. And what is this vision without sympathy, an imitative sympathy which puts us in another's place, which carries over their agitations to our own breasts, which makes our life a little world, able to reproduce the great one in abstract?"

এই সহানুভূতি ছিল বলিয়াই দীনবন্ধু নাটক-রচনায় সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

৩

দীনবন্ধুর পরবর্ত্তী নাট্যকারগণ

মধুসূদন ও দীনবন্ধু পথিপ্রদর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে নাটক-রচনার পথে অগ্রসর হইবার মত বাঙ্গালীর অভাব হয় নাই। বিশেষ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে ইংরেজী নাটক কেবল যে অধিকসংখ্যক বাঙ্গালীর দ্বারা পঠিত হইতে থাকে, তাহাই নহে—বাঙ্গালায় তাহার অনুবাদও হইতে থাকে এবং সেই অনুবাদের সাহায্যে আরও বহু লোক সেক্সপীয়র প্রভৃতির নাটকের স্বাদ পাইতে থাকেন।

এই সকল কারণে বাঙ্গালা নাটকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এমন কি দীনবন্ধুর বন্ধু—বাঙ্গালায় 'ভৈষজ্য-রত্নাবলী'-প্রণেতা ডক্টর দুর্গাদাস করও পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থিতিকালে 'স্বর্ণশৃঙ্খল' নাটক প্রকাশ করেন। এমনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, দীনবন্ধুর একখানি নাটকের একটি ছড়া তাঁহার রচনা।

দীনবন্ধুর সমসাময়িক নাটককারদিগের মধ্যে এক জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—মনোমোহন বসু। ইনি ২৪ পরগণা জিলার ছোট জাগুলিয়া গ্রামনিবাসী ছিলেন। ইনি 'মধ্যস্থ' নামক সংবাদপত্র প্রচার করিয়াছিলেন; কবি-গান ও হাফ আখড়াই গান-রচনায় ইঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। ইনি বিদ্যালয়ে পাঠ্য কবিতা-পুস্তক 'পদ্যমালা' প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে ডাবের কথায় ছিল—

> "দুই তিন আনা ভিন্ন সোডা নাহি মিলে,
> খাসা ডাব পাই এক ষষা পাই দিলে।"

পেয়ারার কথা—

"পেয়ারা হে কি গুণ তোমার!
কাঁচা খাই, ডাঁসা খাই, পাকার ত কথা নাই—
সব তা'তে তৃপ্তি রসনার।"

তিনি রাজনীতিচর্চ্চাও করিতেন—দ্বিতীয় বার্ষিক চৈত্র মেলায় (হিন্দু মেলা) তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহার আরম্ভ এইরূপ :—

"স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে বোধ হয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দ-বাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নির্ম্মৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। এই বীজ স্বদেশ-ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্ন-বারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ-তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটী মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে যে, যখন জাতি-গৌরবরূপ তাহার নবপত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারতভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে 'স্বাধীনতা' নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখনো দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথামাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে সে ফল না পাই, অন্ততঃ 'স্বাবলম্বন'নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না। ফলতঃ একতাই সেই মিলনসাধনের একমাত্র উপায় এবং অদ্যকার এই সমাবেশরূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্যস্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

মনোমোহনের রচিত নাটকগুলিতে পুরাতন রীতির সহিত নূতন রীতির সামঞ্জস্য-সাধনের চেষ্টা ছিল। কোন কোন নাটক তিনি আবার যাত্রার পালায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। সেগুলিকে নূতন যাত্রার প্রবর্ত্তক বলা যায়।

মনোমোহনের প্রথম নাটক 'রামাভিষেক'। ইহা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে করুণ রসের আধিক্য থাকায় বাঙ্গালী দর্শক ও পাঠকদিগের চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, ইহা পৌরাণিক নাটক। ইহাতে গ্রাম্যতার অভাব—গানও অনেকগুলি। দুই বৎসর পরে (১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে) মনোমোহনের দ্বিতীয় নাটক 'প্রণয়-পরীক্ষা' প্রকাশিত হয়। ইহা পৌরাণিক নাটক নহে এবং ইহাতে কোন ধনীর পুত্রসন্তান না হওয়ায় দ্বিতীয় দারপরিগ্রহে দুই স্ত্রীর মধ্যে অপ্রীতিহেতু সংসারে যে অশান্তি তাহারই চিত্র লইয়া ইহার আখ্যানবস্তু জটিল করা হইয়াছে। ইহার অধিক অংশ গদ্য হইলেও, ইহাতে মিত্র ও অমিত্র ছন্দে লিখিত উক্তিরও অভাব নাই। ইহাতে গানও অনেক। এই নাটকে মনোমোহন প্রথম পাগল বা তদ্রূপ চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার 'সতী নাটকে' সেরূপ চরিত্র শান্তিরামে পরিণতি প্রাপ্ত হয় এবং পরবর্ত্তী কালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার কোন কোন নাটকে সেইরূপ চরিত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। মনোমোহনের আর একখানি পৌরাণিকাতিরিক্ত নাটক—'আনন্দময় নাটক'। তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে 'সতী নাটক' সর্ব্বপ্রধান। ইহা দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ লইয়া রচিত। সে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের কথা হইলেও তখনও যে প্রাচীনপন্থী-দিগের নিকট বিষাদান্ত নাটক অপ্রীতিকর ছিল, তাহার প্রমাণ—পরে ইহাকে মিলনান্ত করিবার জন্য "হর-পার্ব্বতী-মিলন" নামক একটি অঙ্ক যোগ করিতে হইয়াছিল। মনোমোহন সে সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"ইহা আধুনিক রুচির অনুমোদিত না হইলেও প্রাচীন রুচির বিশেষ অনুরোধে নাটক-প্রচারের কিছুদিন পরে রচিত, অভিনীত ও সম্ভ্রান্ত অভিনেতাদিগের সুবিধার্থ কেবল কুড়িখানি মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল।" দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি লিখিয়াছিলেন—"বিয়োগান্ত নাটক-প্রিয় মহাশয়েরা সে অংশটি বর্জ্জন এবং পুনর্ম্মিলনানুরাগী মহাশয়েরা গ্রহণপূর্ব্বক অভিনয় করিতে পারেন।"

বিষাদান্ত নাটক সম্বন্ধে এ দেশে বহু দর্শকের অপ্রীতির উল্লেখ আমরা 'কীর্ত্তি-বিলাস' নাটকের ভূমিকায় দেখিয়াছি।

মনোমোহনের আর একখানি নাটকও আদর লাভ করিয়াছিল—'হরিশ্চন্দ্র নাটক' (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ)। ইহা যাত্রারূপে বিশেষ প্রচারিত হয়। ইহার গানগুলির কয়টি রাজনীতিক উক্তি। ১২৮০ বঙ্গাব্দে বারুইপুরে হিন্দু মেলার জন্য মনোমোহন গোবিন্দ অধিকারীর স্থরে একটি গান রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে ছিল :—

"ঘরে প্রদীপটি জ্বালতে হ'লে বিলিতি বাক্স খুলে
জ্বালতে হয় গো হয়!
আবার বিলিতি ছুঁচ সুতো বই সেলাই নয়।"

পরে সেই গানের ভাব "আরো সংস্কৃত করিয়া ভাল স্থরে ভাল রূপে সাজাইয়া" 'হরিশ্চন্দ্র নাটকে' সংযুক্ত করা হয়। গানটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং ইংরেজ সরকার—স্বদেশী আন্দোলন নামে পরিচিত স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়—ইহার প্রচার নিষিদ্ধ করেন। ইহাতে "স্বদেশী" আন্দোলনের মূল সূত্র আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে হিসাবে ইহার গৌরব অসাধারণ :—

"দিনের দিন সবে দীন, হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ চিন্তাজ্বরে জীর্ণ
অপমানে তনু ক্ষীণ!
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্যভূমে, পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হলো ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে, লজ্জারাহুমুখে লীন!
অতুলিত ধন-রত্ন দেশে ছিল, যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল, এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন!
তুঙ্গ দ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে, সার শস্য গ্রাসে যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন!

তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার, সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর, হলো দেশের কি দুর্দ্দিন !
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ, কলের বসন বিনা কিসে র'বে লাজ ?
ধর্ব্বে কি লোক তবে দিগম্বর-সাজ—
বাকল, টেনা ডোর, কপিন ?
ছুঁই সুতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে, দীয়াশলাই কাটি তাও আসে পোতে;
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে—
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।"

বলা বাহুল্য, বর্ণিত অবস্থা হরিশ্চন্দ্রের সময়ের নহে—মনোমোহন বাবুর সময়ের—বিদেশী কুশাসনপীড়িত ভারতবর্ষের।

ঐ নাটকেই আর একটি গানে করবাহুল্যের প্রতিবাদ দেখা যায়। তাহাতে আয়-করের, রোড সেসের ও লবণের শুল্কের বিষয় উল্লেখ করা হয়—

"আয়-কর শুনে গায় আসে জ্বর, অস্থিভেদী রথ্যা-কর কি দুষ্কর !
লবণটুকু খাব, তা'তেও লাগে কর"—ইত্যাদি।

এই সময়ে যেমন, ইহার পরেও বহুদিন তেমনই বাঙ্গালায় পৌরাণিক ঘটনাবলম্বনে লিখিত ও ধর্ম্মমূলক নাটকের অধিক আদর ছিল। তাহার কারণ—এ দেশের লোকের শিক্ষা ও সংস্কৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, এ দেশে পূর্ব্বে লোকশিক্ষার উপায়ের অভাব ছিল না। তিনি সে সকলের বিলোপে দুঃখ প্রকাশ করেন। কথকতা সেই সকল উপায়ের অন্যতম ছিল :—

"গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বেদী পিঁড়ীর উপর বসিয়া * * * কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমের প্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণ-বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সদলঙ্কারসংযুক্ত করিয়া আপামরসাধারণসমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পিঁজে, যে কাটনা

কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সে-ও শিখিত—শিখিত যে, ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন—বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপপুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে,—পরের জন্য, যে অহিংসা পরম ধর্ম্ম, যে লোকহিত পরম কার্য্য।"

রাজনারায়ণ বাবু বলিয়াছিলেন :—

"রামায়ণ ও মহাভারত আমাদিগের দেশের ধর্ম্মনীতি রক্ষা করিয়াছে। আমাদিগের দেশের ইতর লোকেরা জাহাজি গোরার ন্যায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পশু নহে; ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা বাল্যকাল অবধি রামায়ণ ও মহাভারত-পাঠ শুনিয়া আইসে। কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে, ইউরোপে যে কাজ বাইবেল, সংবাদপত্র ও সাধারণ পুস্তকাগার এই তিনের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহা বঙ্গদেশে কেবল রামায়ণ ও মহাভারত দ্বারা সম্পাদিত হয়।"

এ প্রদেশে প্রচলিত কথা আছে—

"যা' নাই ভারতে,
তা' নাই ভারতে।"

অর্থাৎ মহাভারতে নাই এমন বিষয় নাই। আর আমাদিগের পুরাণের শিক্ষা—ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়; প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু নিবৃত্তির মূল্য অনেক অধিক; ধর্ম্ম মানুষের কর্ত্তব্য; ধর্ম্মকেও রক্ষা করিতে হয় এবং সে জন্য বাহুবলের প্রয়োজন—নির্বৈর ও অহিংসা যত বড়ই কেন হউক না, তাহা গৃহীর ধর্ম্ম নহে। সেই জন্যই গীতার শেষ শ্লোক এইরূপ :—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রী বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্ম্মম॥

সঞ্জয় কহিলা, মোর এ দৃঢ় বিশ্বাস—
যেথা কৃষ্ণ যজ্ঞেশ্বর যেথা পার্থ ধনুর্দ্ধর
সেথা শ্রী বিজয় ভূতি নীতি করে বাস।

অর্থাৎ কেবল ধর্ম্মের দ্বারা সকল কার্য্যসাধন সম্ভব হয় না, সে জন্য বাহুবলেরও প্রয়োজন; উভয়ের সম্মিলনে অভীপ্সিত কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

পুরাণের কাহিনী এ দেশে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই পরিচিত ছিল। পুরাণে হাস্যরসের যেমন, করুণ রসেরও তেমনই বিকাশ দেখা যায়। ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসভাগৃহে দুর্য্যোধনের স্থলে জলভ্রম যেমন হাস্যের উদ্দীপন করে, অভিমন্যুবধ তেমনই অশ্রুর উৎস মুক্ত করে। পিতার আদেশে মাতৃহত্যার মত দারুণ tragedy আর কি হইতে পারে?

ইংরেজী প্রসিদ্ধ নাটকের সহিত বাঙ্গালা নাটকের তুলনা করিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন—বাঙ্গালীর সমাজে ও বাঙ্গালীর জীবনে বৈচিত্র্যের ও কর্ম্মবহুলতার অভাবই বাঙ্গালা নাটকের মৃদুতার কারণ। কিন্তু তাঁহারা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন, ইংরেজী নাটকে আর সেক্সপীয়র প্রভৃতির সময়ের আদর্শ নাই। বাঙ্গালায় যখন নাটক-রচনা ও রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়, তখন বাঙ্গালীর সমাজ চাঞ্চল্যহীন। যখন ইংরেজী নাটকের উন্নতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তখন নাটককার কাহারা? টেন দেখাইয়াছেন—বেন জনশন যাঁহার গর্ভজাত তিনি দ্বিতীয় বারে যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন—তিনি রাজমিস্ত্রী; মার্লোর পিতা জুতা প্রস্তুত করিতেন, অর্থাৎ চর্ম্মকার; সেক্সপীয়র পশমী জিনিষ ব্যবসায়ীর পুত্র; মেসিঙ্গারের পিতা ভৃত্য। ইঁহারা যে কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন—অর্থাৎ সেই 'ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে'; ইঁহারা ঋণ করিতেন, আহারের জন্য অর্থার্জ্জন করিতেন, নাটক রচনা করেন, রঙ্গালয়ে অভিনয় করেন। তখন ইংলণ্ডে রঙ্গালয়, দর্শক ও অভিনেতা কিরূপ?

যখন সেক্সপীয়রের আবির্ভাব, তখন যে সাতটি রঙ্গালয় চলিতেছে, তাহাতেই লণ্ডনের লোকের অভিনয়-দর্শনে আগ্রহ বুঝিতে পারা যায়। রঙ্গালয়ের সাজসজ্জা অসম্পূর্ণ ও কদর্য্য। কিন্তু দর্শকদিগের কল্পনা যেমন সকল অসম্পূর্ণতা উপেক্ষা করিত, তাহাদিগের বলিষ্ঠতা তেমনই তাহাদিগকে সকল অসুবিধা উপেক্ষা করিতে সমর্থ করিত। গ্লোব তখন সর্ব্বপ্রধান রঙ্গালয়। তাহা টেমস নদীর তীরে অপরিচ্ছন্ন স্থানে অবস্থিত। গৃহটি ছয় কোণবিশিষ্ট এবং একটি কর্দ্দমাক্ত জলপূর্ণ পরিখায় বেষ্টিত। যখন অভিনয় চলিত, তখন গৃহ-চূড়ায় একটি রক্তবর্ণ পতাকা উড্ডীন করা হইত। ধনীদিগের যেমন দরিদ্রদিগেরও তেমনই তথায় প্রবেশাধিকার ছিল; তবে দর্শক-মাত্রকেই দর্শনী দিতে হইত—শ্রেণী হিসাবে দর্শনী নির্দ্দিষ্ট ছিল—ছয় আনা, দুই আনা ও এক আনা পর্য্যন্ত। গৃহের যে অংশ আচ্ছাদনহীন তাহাতে যাহারা বসিত, তাহারা বৃষ্টি হইলে ভিজিত; তবে তাহারা প্রায়ই কশাই, দোকানদার, রুটীপ্রস্তুতকারী, নাবিক, শিক্ষানবিশ—ভিজিতে তাহাদিগের আপত্তি ছিল না। লণ্ডনের রাজপথের নর্দ্দমায় ও গর্ত্তে যাহারা অভ্যস্ত, তাহারা সহজে পীড়িত হইত না। যতক্ষণ অভিনয় আরম্ভ না হইত, ততক্ষণ তাহারা আনন্দে সময় অতিবাহিত করিবার জন্য মদ্য পান করিত বাদাম ভাঙ্গিয়া খাইত, ফল খাইত, চীৎকার করিত এবং সময় সময় হাতাহাতি করিত। সময় সময় তাহারা অভিনেতাদিগকে আক্রমণ করিত—রঙ্গালয় ভাঙ্গিয়া "তচনচ" করিত; আবার বিরক্ত হইলে নাটককারকে প্রহার করিত বা কম্বলে তুলিয়া দুলাইত। মদ্যপানের ফলে বিবমিষার উদ্রেক হইত—বমনের জন্য মুক্তাবরণ পিপা থাকিত। যখন দুর্গন্ধ অনুভূত হইত, তখন চীৎকার শুনা যাইত—"জুনিপার পুড়াও"। রঙ্গমঞ্চের উপর থালায় উহা পুড়ান হইলে স্থানটি ধূমে পূর্ণ হইত। টেন বলিয়াছেন যাহারা এইরূপ অবস্থায় অভ্যস্ত, তাহারা কিছুতেই বিরক্ত হয় না—দুর্গন্ধ সহ্য করিতে পারে। যে স্থানে বার আনা

দর্শনী দিয়া লোক বসিত, তাহা অনাবৃত নহে—আর বার আনা দিলে বসিবার জন্য আসন পাওয়া যাইত। ঐ সকল দর্শক তাস খেলিত, ধূমপান করিত, অনাবৃত স্থানের দর্শকদিগকে অপমান করিত। শেষোক্ত দর্শকরা আবার তাহাদিগকে অপমান করিতে ত্রুটি করিত না এবং ফল ছুড়িয়া মারিত।

অপরাহ্ণ তিনটার সময় অভিনয় আরম্ভ হইত। উত্তরকালে চিত্রপটে যাহা বুঝান হইত, তখন তাহা কতকটা অনুমান করিয়া লইতে হইত—ঘটনাস্থান কি তাহা ফলকে লিখিয়া ফলকটি টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইত। কলিয়ার বলেন, দৃশ্যপটের অভাবহেতু অভিনেতাকে অনেক অভাব-পূরণজন্য বক্তৃতার আশ্রয় লইতে হইত—"To this very poverty of stage appliances we are indebted for many noble passages in the works of our earlier dramatists, who found themselves called on to supply, by glowing and graphic description, what in after times, was more commonly left to the touch of the scene-painter."

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লস ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালেই সার উইলিয়াম ডেভিনাণ্টের দ্বারা অভিনেত্রীদিগের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল—তাহার পূর্ব্বে বালকরাই স্ত্রীলোকের অংশ অভিনয় করিত। সেক্সপীয়রের নাটকেও তাহা জানা যায়; হ্যামলেট স্ত্রীলোকের অংশ অভিনয়কারী বালককে বলিয়াছিলেন—"Pray God, your voice like a piece of uncurrent gold, be not cracked within the ring."

তৎকালীন ইংরেজের রঙ্গালয়ের ও রঙ্গালয়ের দর্শকদিগের সহিত বাঙ্গালার রঙ্গালয়ের ও রঙ্গালয়ের দর্শকদিগের তুলনা করিলেই বাঙ্গালা নাটকের মূঢ়তার কারণ উপলব্ধ হইবে।

১৬৬০ খৃষ্টাব্দের পরে—যখন ইংলণ্ডের রঙ্গালয়ের উন্নতির যুগ এবং সেই রঙ্গালয়ের প্রয়োজনে নাটক-রচনা—তাহার দুই শতাব্দীর

কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এ দেশে ইংরেজের রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজী নাটকের অভিনয়। তখন ইংলণ্ডে রঙ্গালয়ের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত—দৃশ্যপট, সাজসজ্জা এ সকলের অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই অবস্থাই এ দেশে ইংরেজদিগের রঙ্গালয়ের আদর্শ এবং তাহারই অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালার ধনীদিগের রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা শ্যামবাজারনিবাসী নবীনচন্দ্র বসু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া স্বীয় গৃহে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় করাইয়াছিলেন। "বেলগেছিয়া ভিলা"য়—দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের উত্তরাধিকারীরা, "মরকতকুঞ্জে" যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বিডন ষ্ট্রীটে নিজ গৃহে রামদুলাল সরকারের পুত্র 'সাতু বাবু' প্রভৃতি কয়খানি নাটকের অভিনয় করাইয়াছিলেন। সে সকল অভিনয়ে ইংলণ্ডের রঙ্গালয় যাঁহারা দেখিয়াছেন সেই উচ্চ-পদস্থ ইংরেজরা নিমন্ত্রিত হইতেন এবং তাঁহাদিগের জন্য বাঙ্গালা নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করাইয়া তাঁহাদিগকে উপহার দেওয়া হইত। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ধনীরাও সে সকল অভিনয়ে নিমন্ত্রিত হইতেন। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন :—

"মহারাজের (অর্থাৎ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের) বাগানে 'মালতী-মাধব' অভিনীত হইল। * * * বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে রাজবাড়ীতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। পালা শেষ হইলে আমরা বেশ-পরিবর্ত্তন করিতে যাইতেছি, এমন সময় মহারাজ বলিলেন—'পোষাক ছাড়িবেন না ; লাটসাহেব তলব দিবেন ; কথা কহিতে হইলে খবরদার Sir বলিবেন না, My Lord বলিবেন।' মাইকেল মধুও খুব করিয়া আমাকে শিখাইলেন, My Lord বলায় ভুল না হয়।"

ঐ বারই দর্শকবৃন্দের মধ্যে রেওয়ার মহারাজা ছিলেন। তিনি "দু' গাঁটরি কাশ্মিরী শাল ও এক থালা মোহর আনিয়া বড় রাজাকে বলিলেন,—'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, এইগুলি আমি

অভিনেতৃগণের মধ্যে বিতরণ করি।' বড় রাজা বলিলেন, 'ও কথা মনেও আনিবেন না ; উহারা সকলেই আমারই মত ভদ্রলোক। উহারা কখনই এরূপ দান গ্রহণ করিবেন না।'"

মহেন্দ্র বাবুই বলিয়াছেন, বীডন ষ্ট্রীটে প্রসিদ্ধ ধনী রামদুলাল সরকারের পুত্র 'সাতু বাবু' যখন তাঁহার গৃহে 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় করান, তখন তাঁহার দৌহিত্র রাণী সাজিয়া বিশ হাজার টাকার অলঙ্কার পরিধান করিয়া রঙ্গমঞ্চে আসিয়াছিলেন।

প্রায় দুই শত বৎসরে ইংলণ্ডের রঙ্গালয়ে যে উন্নতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—তাহাই আদর্শ করিয়া বাঙ্গালায় এই সকল সখের রঙ্গালয় রচিত হইত। সে সকলে সাজসজ্জাও ভালই হইত।

তখন বাঙ্গালায় ধনীদিগের রঙ্গালয়ের ও অভিনয়ের সখ এত প্রবল হইয়াছিল যে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের উত্তরাধিকারীরা তাঁহাদিগের স্বগ্রাম কান্দীতেও রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহনির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রঙ্গালয়রূপে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন কারণে তথায় যাইয়া ঐ গৃহে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, অভিনয় অনেক সময় ধনীদিগের বাসগৃহে হইত। মহেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "'সাতু বাবু'র গৃহে অভিনয়ের পূর্ব্বে যিনি গান-রচনা করিতেন তিনি 'সাতু বাবু'র নিকটে আসিলে বাবু বলিলেন,—'দেখ কবিচন্দ্র, গানগুলি যেন সুন্দর ও সুরুচিসঙ্গত হয়।' তাহাতে তিনি বলিলেন, 'জয় জয় রাম সীতারাম (এই বুলি তাঁহার মুখে চব্বিশ ঘণ্টাই ছিল), আমি কি জানি না যে, আপনি সপরিবারে এখানে বাস করেন? এমন গান গাহিব যে, মেয়েরা উঠিয়া যাইবেন!'"

এই সুরুচিজ্ঞান কেবল সমাজের শিক্ষিত স্তরেই ছিল না ; পরন্তু সকল স্তরেই ব্যাপ্ত ছিল। সেই জন্যই "কবিগান" যেমন বাজারে

একরূপ হইত, তেমনই গৃহস্থের গৃহে অন্যরূপ হইত; 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা-সম্বন্ধেও ঐরূপ হইত—পালা দুই প্রকার থাকিত।

এ দেশের সংস্কৃতির প্রভাবে ধর্ম্মজ্ঞান ও স্ত্রীলোকদিগের প্রতি শ্রদ্ধা আপামরসাধারণের ধাতুগত হইয়াছে। ইহা হিন্দু-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এবং ইহার জন্য হিন্দু অবশ্যই গৌরবানুভব করিতে পারে। হিন্দু ব্যতীত ভারতে অন্য সকল সম্প্রদায়-সম্বন্ধেও যদি এই কথা বলা সম্ভব হইত, তাহা হইলে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা এই বাঙ্গালাতেই সংঘটিত হইত না। কিন্তু সে কথা আমাদিগের আলোচ্য নহে।

বাঙ্গালা নাটক বাঙ্গালীর জন্য রচিত—বাঙ্গালা রঙ্গালয়ের অভিনয় বাঙ্গালী নর-নারীর জন্য। সুতরাং সে সকলে হিন্দুর কালক্রমাগত সংস্কারজনিত ভাব প্রকাশ পাওয়াই স্বাভাবিক। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গৃহে 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয়ের পূর্ব্বে 'সাতু বাবু'র সঙ্গীতরচয়িতাকে সতর্কবাণীর উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। তাহাতে হিন্দু গৃহস্থের গৃহে মহিলাদিগের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-বুদ্ধির পরিচয় সপ্রকাশ।

হিন্দু মহিলারাও সর্ব্বতোভাবে সেই শ্রদ্ধার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মমত-প্রচারক প্রসিদ্ধ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে লিখিত একটি প্রবন্ধে বাঙ্গালী হিন্দু পরিবারের নবীনাদিগের সহিত প্রবীণাদিগের তুলনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালে যে সকল সামাজিক প্রথা অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হয়, সে সকলই নিন্দনীয় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ স্বাভাবিক। তিনি বলেন :—

"The ancient model for the woman's life was her absolute domesticity. Wife or widow, girl or grand-mother, she practised all her life an utter self-devotion to the household, outside of which she recognised no

obligations. ....This predominant domesticity made the old time Hindu woman.........quite a character whose place in the home and neighbourhood had to be reckoned with. Another characteristic of the old system was the unvarying religiousness of the Hindu lady. Men were not particularly careful of their spiritual or even moral concerns, but it was a most exceptional thing to hear anything said against the religiousness, regularity, or ethical correctness of the Hindu household. The simple reason of it was that the ladies ruled there."

প্রতাপ বাবু লিখিয়াছিলেন, তিনি বহুদিন পূর্ব্বে রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের প্রথাসকল বর্জ্জন করিলেও হিন্দুগৃহের সরলতা, নিয়মনিষ্ঠা, আরাম ও করুণাশীলতা তাঁহার স্মৃতি হইতে কখনই অপনীত হইবে না এবং যখনই তিনি সেই সকলের অভিজ্ঞতা স্মরণ করেন, তখনই হিন্দু মহিলাদিগের প্রসন্ন মুখ তাঁহার মনে পড়ে।

হিন্দু স্ত্রীলোকরা যে আদর্শে আপনাদিগকে গঠিত করিতেন, সে আদর্শ পুরাণে প্রশংসিত এবং লোকপরম্পরায় আদৃত ও সংরক্ষিত। সেই জন্যই বাঙ্গালী নাটককারগণ পুরাণের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া নাটক-রচনায় আগ্রহ প্রকাশ করিতেন—পূর্ব্বেও করিয়াছেন, এখনও করেন।

কিন্তু পুরাণই তাঁহাদিগের একমাত্র উপজীব্য হয় নাই। প্রথম প্রকাশিত নাটকদ্বয়ের একখানি ('কীর্ত্তি-বিলাস') গার্হস্থ্য, অপরখানি ('ভদ্রার্জ্জুন') পৌরাণিক ঘটনাবলম্বনে লিখিত। 'কীর্ত্তি-বিলাস' লেখকের কল্পনা-প্রসূত ; 'ভদ্রার্জ্জুন' পৌরাণিক ঘটনা কল্পনারঞ্জনে রঞ্জিত। সুভদ্রার বিবরণ মধুসূদনকেও আকৃষ্ট করিয়াছিল। 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'তে তিনি 'সুভদ্রাহরণ' শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছিলেন :—

"তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্গাসরে
নবতানে, ভেবেছিনু, সুভদ্রাসুন্দরি !
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে, আশার লহরী
শুকাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে।
* * * *
কিন্তু (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে
ভাগ্যবানতর কবি, পূজি দ্বৈপায়নে,
ঋষিকুলরত্ন দ্বিজ, গাবে গো ভারতে
তোমার হরণ-গীত তুষি বিজ্ঞজনে,
লভিবে সুযশঃ, সাঙ্গি এ সঙ্গীতব্রতে।"

বহুদিন পরে নবীনচন্দ্র সেন এই ব্রত সাঙ্গ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার নাটক-লেখকগণ যে গার্হস্থ্য আখ্যানবস্তু লইয়া বহু নাটক-রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। সে সকলের মধ্যে কতকগুলি— রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের মত সামাজিক কুপ্রথার দোষ-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রচিত, কতকগুলি বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের সাধারণ বা অসাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। সে সকলের মধ্যে কতকগুলি ইতোমধ্যেই পরিবর্ত্তিত সমাজের চিত্র। বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে পরিবর্ত্তন দ্রুতই হইয়াছে ও হইতেছে। দীনবন্ধুর পুস্তক সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 'লীলাবতী' নাটক যে নাটক হিসাবে দীনবন্ধুর অপরিসীম যত্নের উপযুক্ত হয় নাই, তাহার অন্যতম কারণ,—লীলাবতীর মত নায়িকা বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে ছিল না—সে চরিত্র দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। ঐ নাটক ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী অর্দ্ধ শতাব্দীতে সমাজে প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন কত দ্রুত হইয়াছে, তাহার পরিচয় হেমচন্দ্রের কবিতায় পাওয়া যায়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' দ্বিতীয়

খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাহাতে 'বাঙ্গালীর মেয়ে'র বর্ণনা ছিল—ব্যঙ্গচিত্র বা caricature বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অর্থাৎ তাহাতে বাঙ্গালী নারীদিগের ত্রুটিগুলি অতিরঞ্জিত করা হইয়াছিল। ইহা যে ব্যঙ্গচিত্র তাহার প্রমাণ কবিতার শেষাংশে পাওয়া যায়:—

"হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে—
মৃদু মৃদু হাসিটুকু অধরে রঞ্জন,
সাবাস সাবাস নাক চোকের গড়ন;
কালো চুলে কিবা ঘটা, চোকে কালো তারা,
দেখে নাই যারা কভু দেখে যাক তারা।
ভাসা ভাসা খাসা চোক তুলি দিয়ে আঁকা!
তা' উপরি কিবা সরু ভুরুযুগ বাঁকা!
থমকে ঠমকে থির গতি কি সুন্দর,
হাসি হাসি মুখখানি কিবা মনোহর!
আহা আহা লজ্জা যেন গায়ে ফুটে আছে—
কোথা লজ্জাবতী তুই এ লতার কাছে?
চক্ষু যদি থাকে কারো তবে দেখ চেয়ে,—
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে।"

তাহার কয় বৎসর পরেই যখন দুইজন বাঙ্গালী ছাত্রী—চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়—বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি লাভ করেন, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন:—

"কে বলে রে বাঙ্গালীর জীবন অসার?
সৌরভে আমোদ দেখ আজ কি বা তার।
* * * *
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।
ভাসিল আনন্দভেলা কালের জুয়ারে।"

তাহার পরে আজ রাজনীতিতে যেমন চাকরীর ক্ষেত্রেও তেমনই নারী কর্ম্মী দেখা যাইতেছে।

এই দ্রুত পরিবর্ত্তনের ফলে নাটকের নূতন উপকরণও পুঞ্জীভূত হইয়াছে ও হইতেছে।

বাঙ্গালায় সামাজিক ঘটনা লইয়া লিখিত অথবা গার্হস্থ্য অনেকগুলি নাটক যে নাটককারদিগের ক্ষমতার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। অমৃতলাল বসুর নাটকে ও প্রহসনে যে সকল চিত্র ব্যঙ্গ হিসাবে অঙ্কিত হইয়াছিল, সে সকল আজ আর অস্বাভাবিক বলা যায় না—বাস্তবের বর্ণে চিত্রিত মনে হয়।

পৌরাণিক নাটকগুলি যে কেবল করুণরসপ্রধান, এমন নহে। সুভদ্রার কাহিনীই তাহার দৃষ্টান্ত।

বাঙ্গালার নাটক-লেখকগণ—মধুসূদন হইতে গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদ-প্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল এবং তৎপূর্ব্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া নাটক রচনাও করিয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের ও ক্ষীরোদপ্রসাদের একাধিক ঐতিহাসিক নাটক ইংরেজ শাসকদিগের বিবেচনায় রাজদ্রোহাত্মক বলিয়া নিষিদ্ধও যে হয় নাই, এমন নহে। টডের 'রাজস্থানে'র পরে গ্রন্থকারগণ অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ সন্ধান করিয়া নাটক-রচনা করিয়াছেন। সে জন্য তাঁহাদিগকে অনেক সময় প্রভূত পরিশ্রমও করিতে হইয়াছে; বহু পুস্তক পাঠ করিতে হইয়াছে। তাঁহারা মনে করিতেন:—

"যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তা'-ই,
পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি নাটকে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টাও সংস্কৃত নাটক বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করিবার চেষ্টার মত হইয়াছিল।

দীনবন্ধু ও মনোমোহনের সময় হইতেই রঙ্গালয়ের প্রয়োজনে নাটকের প্রয়োজন বর্দ্ধিত হইয়াছিল। রঙ্গালয়ের সংখ্যাও বাড়িতেছিল।

সেই জন্যই কলেজের অধ্যাপক ক্ষীরোদপ্রসাদও নাটক-রচনায় আকৃষ্ট হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

তখন যাঁহারা নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন উপেন্দ্রনাথ দাস তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি নাটকে যেমন চমৎকৃত করিবার উপকরণ দিয়াছিলেন, তেমনই তাঁহার নাটকে অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদিগের বিরুদ্ধে লোককে উত্তেজিত করার চেষ্টাও ছিল। দীনবন্ধু ইংরেজসম্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন —উপেন্দ্রনাথ ইংরেজ-শাসনের—পরাধীনতার বিরোধী ছিলেন। সেই কারণে, তাঁহার 'শরৎ-সরোজিনী' (১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ) ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' আদৃত হইয়াছিল। তাঁহার নাটকের জন্যই ইংরেজ সরকার ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে Dramatic Performances' Control আইন করেন।

যিনি বহু বরেণ্য বাঙ্গালীর জীবনকথা লিপিবদ্ধ করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, সেই মন্মথনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন: জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ইংলণ্ডের যুবরাজ (পরে সপ্তম এডওয়ার্ড)কে স্বীয় গৃহে মহিলাদিগের দ্বারা অভিনন্দিত করায় হেমচন্দ্র ব্যঙ্গ কবিতা 'বাজীমাৎ' রচনা করেন, তখন—

"জাতীয় সম্মান ক্ষুণ্ণ হইল বলিয়া চারিদিকে রব উঠিল। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বসু 'বাজীমাৎ' আবৃত্তি করিতে লাগিলেন এবং উপেন্দ্রনাথের রচিত 'গজদানন্দ' নামে একটি প্রহসন (১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬) অভিনীত করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন এবং অভিনয় বন্ধ করাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ২৩শে ফেব্রুয়ারী নূতন নামে 'গজদানন্দ' অভিনীত হইল। অভিনয় বন্ধ করার কোন আইন না থাকায় বড়লাট বাহাদুরের অর্ডিন্যান্স দ্বারা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ অভিনয় বন্ধ করার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। পুলিশ নিষেধ করিলেও উপেন্দ্রনাথ 'হনূমান-চরিত' নামে উহা পুনরভিনীত করিলেন।

পরবর্ত্তী ১লা মার্চ্চ উপেন্দ্রনাথের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নামক নূতন নাটকের অভিনয়ের পরে 'Police of Pig and Sheep' নামক একটি প্রহসন অভিনীত হয়। এই প্রহসনে তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার সার ষ্টুয়ার্ট হগ ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট মিঃ ল্যাম্ব-এর অন্যায় আচরণের শ্লেষাত্মক সমালোচনা করা হইয়াছিল। শেষোক্ত প্রহসনের অভিনয় অর্ডিন্যান্সপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে বন্ধ করা হইল। এইবার পুলিশ ক্ষেপিয়া গেল। তাহারা 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'র কোনও অংশের অভিনয় অশ্লীল বলিয়া উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলালকে এবং থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগী ও অন্যান্য অভিনেতাকে পুলিশ কোর্টে অভিযুক্ত করিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ৫ই মার্চ্চ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডিকেন্সের নিকট বিচার হয়। হাইকোর্টের প্রধান অনুবাদক শ্যামাচরণ সরকার, 'আর্য্যদর্শন'-সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, হাইকোর্টের প্রধান ইণ্টারপ্রিটার মিঃ ওয়েন, ডাক্তার (পরে রাজা) রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, গ্রন্থখানি অশ্লীল নহে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী বলেন, উহা অশ্লীল ত নহেই, সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে উহা রচিত হইয়াছে। আচার্য্য ডাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, উহা যদি অশ্লীল হয়, স্যর ওয়াল্টার স্কটের নভেলকেও অশ্লীল বলিতে হয়। যাহা হউক ডিকেন্স সাহেবের বিচারে উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল দোষী সাব্যস্ত হন এবং (৮ই মার্চ্চ, ১৮৭৬) এক মাস করিয়া বিনাশ্রমে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।"

রায় প্রকাশিত হইলেই উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টে আবেদন করিয়া আসামী দুইজনকে জামিনে খালাস করেন এবং পরে মামলায় আসামীরা নিরপরাধ বলিয়া খালাস পাইয়াছিলেন। তখন সরকার পূর্ব্বোক্ত আইন করেন।

সেই সময়ের পরেই যাঁহারা নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,

রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহাদিগের অন্যতম। রাজকৃষ্ণ নিজ চেষ্টায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং মূল রামায়ণ ও মহাভারত বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি বহু নাটক, প্রহসন, ছেলে-ভুলান কথা, উপন্যাস-রচনায় যেন শ্রান্তি অনুভব করিতেন না। তাঁহার 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটক ১২৮৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"আমি ১২৮৫ সালে 'নিভৃত নিবাস' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করি। তাহার দ্বিতীয় সর্গের কিয়দংশ এইরূপ ভাঙ্গা-অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়াছিলাম।"

অমিত্রাক্ষরে রচনায় কালীপ্রসন্ন সিংহ মধুসূদনের পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহার অমিত্রাক্ষর-রচনা পয়ার নহে। তাহার পরে ভাঙ্গা-অমিত্রাক্ষর ক্রমে নানারূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনায় নূতন ছন্দে পরিণতি লাভ করে। অক্ষর-সংখ্যা-সম্বন্ধে উপেক্ষা দেখাইয়া গিরিশচন্দ্র "দম" ও বেগসম্বন্ধে অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন।

রাজকৃষ্ণের নাটক 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' যখন বিডন ষ্ট্রীটে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়, তখন তাঁহার রচনার অধিক আদর হয়। ঐ নাটক ধর্ম্মমূলক। উহাতে অনেকগুলি গান ছিল। সে সকলের মধ্যে—

"রতন-আসনে রতন-ভূষণে
যুগল রতন রাজে ;
চরণে নূপুর আহা কি মধুর,
রুণু ঝুনু রুণু বাজে।"

প্রভৃতি গান লোকপ্রিয় হইয়াছিল। রাজকৃষ্ণ রঙ্গালয়ের প্রয়োজনে কয়দিনের মধ্যে ঐ নাটকখানি রচনা করেন। যখন অভিনয় আরম্ভ হয়, তখনও সব গান রচিত হয় নাই—রঙ্গালয়ের

কর্ত্তারা অন্যের দ্বারা গানগুলি রচনা করাইয়া লইয়াছিলেন—পরে রাজকৃষ্ণ আপনার মনোমত গান যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করেন। "In literature a thing becomes his at last who says it best." সেই জন্যই ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' আর সকল কবির, এমন কি রামপ্রসাদেরও, 'বিদ্যাসুন্দরে'র আদর হরণ করিয়াছে। কারণ, ভারতচন্দ্রের রচনা কথার তাজমহল। তেমনই উৎকৃষ্ট রচনা বলিয়া 'প্রহ্লাদ-চরিত্রে'র যে সকল গান সমাদর লাভ করিয়াছিল—সে সকলই হয়ত রাজকৃষ্ণের রচনা নহে।

রাজকৃষ্ণ স্বয়ং কলিকাতা মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে (বর্ত্তমান কেশব সেন ষ্ট্রীট) একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই বীণা থিয়েটারে তাঁহার বহু নাটক ও প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল। তখন পেশাদার রঙ্গালয়সমূহে অভিনেত্রীর আবির্ভাব হইয়াছে—কোন কোন অভিনেত্রীর অভিনয়পটুত্ব প্রশংসিত হইয়াছিল। কিন্তু রাজকৃষ্ণের বীণা থিয়েটারে বালকগণ নারীর অংশ অভিনয় করিত।

রাজকৃষ্ণ রায়ের আরও কয়েকখানি নাটক আদর লাভ করিয়াছিল। সে সকলের মধ্যে 'নরমেধ-যজ্ঞ', 'লক্ষ হীরা', 'বনবীর', 'লয়লা-মজনু' প্রধান।

যে সময়ে রাজকৃষ্ণ নাটক-রচনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে কলিকাতায় একাধিক পেশাদারী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে সকলের জন্য নাটকের ও প্রহসনের প্রয়োজন হইয়াছিল। তখন কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী। "বড়দিনে"র পূর্ব্বেই সহর জাঁকিয়া উঠিত। তখন বড়লাট সিমলা শৈল হইতে যেমন কলিকাতায় আসিতেন কোন কোন সামন্ত নৃপতিও তেমনই কলিকাতায় আসিতেন, আবার মফঃস্বলের নানা স্থান হইতে লোক আনন্দ উপভোগের জন্য, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ প্রভৃতি—ছুটী পাইয়া—চাকরীতে উন্নতির জন্য তদ্বির করিতে আসিতেন। সরকারের ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের "বড়" ও "ছোট" "সাহেবরা" ভেট পাইতেন—কমলানেবু, কলা, ভেটকী

মাছের দাম বাড়িত। তখন রঙ্গালয়ে নূতন সজ্জা এবং নূতন নাটক ও প্রহসনের অভিনয় আরম্ভ হইত। তখনও ইংরেজ ও সামন্ত নৃপতিদিগের সম্বন্ধে লোকের একটু ভিন্ন ধারণা ছিল। যদিও কেহ কেহ বলিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন লিখিয়াছেন—বস্তু তিন প্রকার—চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ, তেমনই রাজা তিন প্রকার—চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ—চেতন রাজা ইংরেজ, অচেতন রাজা সামন্ত নৃপতি, উদ্ভিদ রাজা (অর্থাৎ ভুঁইফোড়) রাজদত্ত উপাধিতে রাজা—তবুও তখন বড় বড় ইংরেজ ও সামন্ত রাজা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইলে তাহা সম্ভ্রমজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। যখন বাঙ্গালায় পেশাদারী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন যে বড়লাটকেও অভিনয় দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইত, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পেশাদারী রঙ্গালয়েও সেই প্রথার অবশেষ ছিল। একবার বরদা রাজ্যের মহারাজা—গায়কবাড়—কলিকাতায় আসিলে ষ্টার থিয়েটারের অধিকারীরা তাঁহাকে অভিনয় দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে তাঁহারা রঙ্গালয়ের সাজসজ্জার উন্নতি সাধন করেন, এবং তিনি আসিবেন জানাইয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। শেষে কোন কোন লোকের আপত্তিতে তিনি—অভিনয়ের দিন—নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। তাহার কারণ, যে সকল স্ত্রীলোকের নৈতিক সম্ভ্রম নাই তাহারা রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী, সেরূপ রঙ্গালয়ে গায়কবাড়ের গমনে—পরোক্ষভাবে—দুর্নীতির সমর্থন করা হইতে পারে। রঙ্গালয়ের অধিকারীরা বড় আশায় হতাশ হইয়া—দর্শকদিগের দ্বারা অপমানিত হইবার আশঙ্কায়, "সঙ্গীত-সমাজে" নাট্যমোদীদিগের শরণাপন্ন হয়েন। তখন কয় জনের অনুরোধে হেমচন্দ্র বসুমল্লিক যাইয়া গায়কবাড়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার সহিত গায়কবাড়ের পরিচয় ছিল। তিনি গায়কবাড়ের আপত্তির কারণ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করেন, গায়কবাড়ের প্রাসাদে যে সকল নর্ত্তকী মুজরা করে, তাহারা

কি সীতা-সাবিত্রীর মত? নিরুত্তর হইয়া গায়কবাড় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন।

এই "সঙ্গীত-সমাজ" সে কালের ধনীদিগের অনুসরণে—কিছু পরিবর্ত্তিত প্রতিষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ইহার সদস্য ছিলেন এবং 'বিসর্জ্জন' নাটকের অভিনয়ে তিনি অভিনেতাও ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান প্রথমে কালীপ্রসন্ন সিংহের গৃহে ও পরে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ছিল। ইহাতে 'বিসর্জ্জন', 'রিজিয়া', 'মেঘনাদবধ', 'পুনর্ব্বসন্ত', 'ধ্যানভঙ্গ', 'চিরকুমার সভা' প্রভৃতি বাঙ্গালা পুস্তক এবং সেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজার' ইংরেজীতে অভিনীত হইয়াছিল। "সমাজে"র সদস্যগণই অভিনেতা হইতেন—স্ত্রীলোকের অংশ অভিনয়ের জন্য কয়টি বালক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সমাজ প্রধানতঃ ধনীদিগের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ও তাঁহাদিগের অর্থে পরিচালিত হইত। তবে পরিচালকগণ গুণের আদর করিতেন এবং বহু শিক্ষাখ্যাতিসম্পন্ন লোককে সঙ্গী করিয়াছিলেন। বিশেষ যাঁহাদিগের সাহিত্যিক খ্যাতি ছিল, তাঁহাদিগকে আনিবার চেষ্টা হইত। সে কার্য্যে প্রথমাবস্থায় অন্যতম পরিচালক সুধী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রণী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যৌবনে 'পুরুবিক্রম' প্রভৃতি নাটক ও কয়খানি উৎকৃষ্ট প্রহসন রচনা করিয়া তখন বহু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সে বিষয়ে তাঁহার কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়। আবার তিনি বালগঙ্গাধর তিলকের গীতার ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদও করিয়াছিলেন। 'পুরুবিক্রম' নাটকের সমালোচনায় 'বঙ্গদর্শনে' (১২৮১ বঙ্গাব্দে) লিখিত হয়:—

"লেখক যে কৃতবিদ্য এবং নাটকের রীতিনীতি বিলক্ষণ জানেন, তাহা গ্রন্থ পড়িলেই বোধ হয়। * * * 'পুরুবিক্রম' সন্দর্শনে যে অন্তরাত্মা জাগিল না, তাহাতেই আমাদের দুঃখ হইয়াছে। যাহা হউক এইরূপ কৃতবিদ্য এবং মার্জ্জিতরুচি মহাশয়গণ নাটক-প্রণয়নের

ভার গ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে নিতান্ত পক্ষে বাঙ্গালা নাটকের বর্ত্তমান অশ্লীলতা এবং কদর্য্যতা থাকিবে না।”

‘বঙ্গদর্শনে’র সমালোচনায় যেমন উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রশংসা তেমনই প্রয়োজনে নিন্দা ব্যক্ত হইত। ‘তারা বাই’ নামক নাটকের সমালোচনা তাহার নিদর্শন—

“গ্রন্থখানিতে প্রশংসা অপ্রশংসার কিছুই নাই। বীররসপ্রধানা নায়িকা তারাবাই বলিতেছেন—নায়ককে বলিতেছেন—‘শুলক্ষের পতিনিষ্ঠা দেখে আমার ইচ্ছা হয় যেন আমি তার মতন অনন্ত বাহুশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, নারীজীবনের সার পতিরূপ সারাল নিমতরুকে চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করি।’ ”

‘বঙ্গদর্শনে’র মন্তব্য—“এমন পিত্তনাশক উপমা কস্মিন্‌কালে দেখি নাই।”

‘বঙ্গদর্শন’ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন প্রহসনের আদর্শ মোলেয়ারের প্রহসন হইতে গৃহীত। তাহাতে গ্রাম্যতা বা অশ্লীলতা নাই। তাঁহার পরে অমৃতলাল বসুর প্রহসনেও যে তিক্ততা ছিল—জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর প্রহসন তাহা হইতেও মুক্ত। ‘অলীক বাবু’ তাহার নিদর্শন।

দীনবন্ধুর সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যে মোটা রসিকতা সেকালের রচনার বৈশিষ্ট্য বলিয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনায় তাহার স্থান ছিল না।

‘সঙ্গীত-সমাজ’ এক সময়ে সুরুচিসঙ্গত নাটকাদির অভিনয়কেন্দ্র হইয়াছিল। এই ‘সমাজে’র উদ্যোগে ত্রিপুরার তৎকালীন মহারাজাকে, কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপকে ও আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে অভিনন্দিত করা হয়। তিনটি অনুষ্ঠানেই রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করিয়াছিলেন। প্রথম অনুষ্ঠানের গানের আরম্ভ—

"রাজ-অধিরাজ, তব ভালে জয়মালা।
ত্রিপুরপুরলক্ষ্মী বহে তব বরণ-ডালা।"

দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের গানের আরম্ভ—

"স্বাগত নৃপেন্দ্র মহারাজ কুচবিহার।"

তৃতীয় অনুষ্ঠানের গানের আরম্ভ :—

"জয়, তব হ'ক জয়।"

তাহাতে জগদীশচন্দ্রকে বলা হইয়াছিল :—

"জ্ঞান-মন্দিরে জ্বালায়েছ তুমি যে নব আলোক-শিখা,
তোমার সকল ভ্রাতার ললাটে দিল উজ্জ্বল টিকা।"

"বড় দিনে"র সময় নূতন নাটক ও প্রহসনের অভিনয় হইবে ; সে জন্য লেখকরা সময় থাকিতে প্রস্তুত হইতেন। সেই কারণে—রঙ্গালয়ের প্রয়োজনে নূতন নাটক রচিত হইত। নাট্যকারদিগের মধ্যে যাঁহারা অভিনেতা হিসাবে রঙ্গালয়ের সহিত সম্পর্কিত থাকিতেন, তাঁহাদিগের যেমন সুবিধা তেমনই অসুবিধা থাকিত। সুবিধা—তাঁহারা দর্শকদিগের রুচির সহিত পরিচিত থাকায় কিরূপ নাটক "জমিবে" অর্থাৎ অধিক দর্শক আকৃষ্ট করিতে পারিবে, তাহা জানিতেন এবং সেইজন্য সেইরূপ নাটক রচনা করিতেন। অসুবিধা—তাঁহারা তাঁহাদিগের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের গুণ ও ত্রুটি জানিতেন এবং যাঁহাকে যে অংশ অভিনয় করিতে দিবেন, তাহা স্থির করিয়া, রচনা তাঁহাদিগের অভিনয়োপযোগী করিতেন। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে এই উক্তি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা যায়।

রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অনেক নাটক বা প্রহসন বা গীতিনাটকের লেখকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও রচিত গান যেমন মধুর তেমনই ভাবগৌরবান্বিত। দৃষ্টান্ত-

স্বরূপ অতুলকৃষ্ণ মিত্রের একটি গানের উল্লেখ করা অসঙ্গত হইবে না। গানটি বাঙ্গালায় বহুস্থানে বহুদিন গীত হইয়াছে,—এখনও হয়—

"আর ত ব্রজে যা'ব না, ভাই, যেতে প্রাণ আর নাহি চায়।
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে, তা'ই এসেছি মথুরায়।
মা পেয়েছি, বাপ পেয়েছি, ছেলেখেলা ভুলে গেছি;
তোমরা সবাই 'মা' ব'লে, ভাই, ভুলিয়ে রেখো মা যশোদায়;
ননী খেও, গোঠে যেও, প্রেম বিলাইও গোপিকায়;
আমার মত বাঁকা হয়ে দাঁড়িও রে কদম-তলায়;
বাজিও বাঁশী—বাঁশীর রবে ব্রজবাসীর প্রাণ জুড়ায়॥"

অবশ্য বাঙ্গালা নাটক ও প্রহসন অনেক রচিত হইয়াছিল। সে সকলের তালিকা যেমন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' পাওয়া যায়—তেমনই 'বঙ্গদর্শনে'র ও 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের সমালোচনায় সে সকলের পরিচয় প্রকট হয়। ঈশ্বর গুপ্ত যেমন বলিয়াছিলেন—সে সকল "না মিষ্ট না টক" তেমনই কেহ কেহ বলিয়াছেন—সে সকল "ন আটক—নাটক"।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। তাঁহার 'পুরুবিক্রম' নাটকের পরের রচনা—'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ), 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ) ও 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২ খৃষ্টাব্দ)। কয়খানি নাটকই দেশাত্মবোধদ্যোতক। সে সময়ে রঙ্গালয়ে এইগুলির অসাধারণ আদর হইয়াছিল এবং এক সময়ে গ্রন্থকার বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ নাটককারদিগের মধ্যে আসন পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রহসনগুলি এখনও আনন্দপ্রদ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট বাঙ্গালীর সাহিত্যিক ঋণ অসাধারণ।

মনোমোহন রায় প্রণীত 'রিজিয়া' পরবর্ত্তী যুগের নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মধুসূদন যে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনার পরে

রিজিয়ার বিবরণ অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক রচনার অভিপ্রায় পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার লিখিত পত্রে জানা গিয়াছে।

অমৃতলাল বসু একাধারে অভিনেতা, নাটক-লেখক, প্রহসন-লেখক ও রঙ্গালয়ের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার উপভোগ্য প্রহসনগুলিই তাঁহার যশঃ ব্যাপ্ত করিয়াছিল। সে সকলের কয়খানি সমসাময়িক সামাজিক প্রথা বা ঘটনা লইয়া লিখিত। ইংরেজ কবি বায়রণ তাঁহার সমালোচককে উদ্দেশ করিয়া যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার আরম্ভাংশে আছে :—

"Prepare for rhyme—I'll publish right or wrong;
Fools are my theme, let satire be my song."

অমৃতলালের কোন কোন প্রহসন পাঠ করিলে তাহাই মনে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কথায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, তিনি "মেকির বড় শত্রু—সকল রকম মেকির উপর তিনি গালিবর্ষণ" করিয়াছেন। তিনিই আবার বলিয়াছেন :—

"ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিদ্বেষপ্রসূত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা অনেক সময়ে হিংসা, অসূয়া, অকৌশল, নিরানন্দ বা পরশ্রীকাতরতা-পরিপূর্ণ ; পড়িয়া বোধ হয়, ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মা'র পেটে জন্মিয়াছে— দুয়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে—এই নরঘাতিনী রসিকতাও এদেশে প্রবেশ করিয়াছে। 'হুতোম পেঁচার নক্সা' বিদ্বেষপরিপূর্ণ। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না। কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ। কেবল ঘোর ইয়ারকি।"

অমৃতলাল অধিকাংশ স্থলেই ঈশ্বর গুপ্তের অনুবর্ত্তী। তাঁহার রচনায়ও মেকির লাঞ্ছনা। 'বাবু' প্রহসনে তিনি নব্য বাঙ্গালী বাবুর

বিভিন্ন রূপ দেখাইয়াছেন—রাজনীতিক বাবু, বৈজ্ঞানিক বাবু, ধর্ম্মধ্বজী বাবু, দেশহিতৈষী বাবু প্রভৃতি। ইঁহাদিগের কার্য্যের উৎস সন্ধান করিয়া তিনি ভণ্ডামীর সন্ধান পাইয়াছেন। ভণ্ড সেবাব্রতীর উক্তি—"প্রেমের কি অপার মহিমা, কিছুই বুঝা যায় না; অথচ দুর্ভিক্ষ বন্যা প্রভৃতি দেশের কোন অমঙ্গল হ'লেই আমার অন্নকষ্ট থাকে না, বরং কিছু সঞ্চয় হয়। * * * দুর্ভিক্ষের জন্য প্রার্থনা কর, সকল বাসনা পূর্ণ হবে।" অবশ্য অমৃতলাল চোরাবাজার দেখিয়া ও তাহার সৃষ্টিপুষ্টিতত্ত্ব বুঝিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহা হইলে তিনি সে সম্বন্ধে কি লিখিতেন, জানিতে অনেকের কৌতূহল অনিবার্য্য। "রাজনীতিক বাবু" দেশমাতৃকার জন্য ভাবিয়া ব্যাকুল,—আপনার মাতার দুঃখ দূর করিবার অবসর বা ইচ্ছা তাঁহার নাই।

অমৃতলালের 'বিবাহ বিভ্রাট' প্রভৃতির তৎকালে কিরূপ আদর হইয়াছিল, আজ অনেকে তাহা অনুমান করিতেও পারিবেন না। তাঁহার 'সাবাস আটাশ'—কলিকাতা কর্পোরেশনের মত স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাখর্ব্বকারী আইনের প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ আটাশ জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির পদত্যাগ অবলম্বনে লিখিত। সে আইন প্রণয়নের পরোক্ষ—কিন্তু প্রকৃত কারণ—বড়লাটের কর্ম্মচারীদিগের গৃহের ফুটপাথের উপর বারান্দা নির্ম্মাণে আইনের মর্য্যাদারক্ষার জন্য কর্পোরেশনের চেষ্টা। স্বৈরশাসনশীল বিদেশী সরকারের নিকট ভারতীয় প্রধান প্রতিষ্ঠানের সেই সাধু চেষ্টা অপ্রীতিকর হয়—"গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়।" তখন সার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জীর অভিযোগ ও নলিনবিহারী সরকারের উত্তর দুই পক্ষের মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভায় এই ম্যাকেঞ্জী ভারতীয়দিগের অধিকার-দাবীতে ব্যঙ্গ করিয়া একটি কবিতা হইতে কয় ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

প্রহসনেই অমৃতলাল সমধিক দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তবে তিনি গার্হস্থ্য ও পৌরাণিক নাটকও রচনা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার হাস্যরস সে সময়ের সমাজে বিশেষ উপভোগ্য ছিল। এখনও অনেক স্থলে তাহা উপভোগ্য। সেই হাস্যরস যেসকল স্থানে স্বচ্ছ ও নির্ম্মল সে সকল স্থানে তাঁহার রসিকতা লোককে মুগ্ধ করে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং কলিকাতার একটি কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপকের সহকারী ছিলেন। তিনি কেন ও কিরূপে নাটক-রচনায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার বিষয়। 'আলি বাবা' গীতিনাট্য তাঁহার তৃতীয় নাট্য-রচনা—ইহাতেই তাঁহার খ্যাতি ব্যাপ্ত হয়। 'আলিবাবা'র সাফল্য তাঁহাকে ঐরূপ কতকগুলি নাট্যনিবন্ধ-রচনায় প্ররোচিত করিয়াছিল। সে সকলের মধ্যে 'কিন্নরী'র সমধিক আদর হয়। তদ্ভিন্ন তিনি 'নর-নারায়ণ' (১৩১৩ বঙ্গাব্দ), 'ভীষ্ম' (১৩২০ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি কয়খানি পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। তিনি 'ধর্ম্মমঙ্গলে'র লাউসেনের কাহিনী অবলম্বন করিয়া 'রঞ্জাবতী' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বৌদ্ধযুগের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত 'অশোক' (১৩২৪ বঙ্গাব্দ) ও 'বিদূরথ' (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) আদর লাভ করিয়াছিল। ঐতিহাসিক ঘটনাবলম্বনে রচিত তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে 'আলমগীর' (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। উহাই, বোধ হয়, তাঁহার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক। তাঁহার আর কয়খানি ঐতিহাসিক নাটক—'পদ্মিনী' (১৩১৩ বঙ্গাব্দ), 'চাঁদবিবি' (১৩১৪ বঙ্গাব্দ), 'নন্দকুমার' (১৩১৪ বঙ্গাব্দ), 'বাঙ্গালার মসনদ' (১৩১৭ বঙ্গাব্দ), 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৩ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি এবং 'প্রতাপাদিত্য' উল্লেখযোগ্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন নাটকে দেশাত্মবোধের অবতারণা করিয়াছিলেন, তখন তাহা নূতন। যদিও তাঁহার পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলা প্রভৃতি দেশাত্মবোধপ্রচারক প্রতিষ্ঠান-প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজের নিকট প্রতিষ্ঠালাভে উৎসুক ছিলেন না

বলিয়া কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ মিস্টার লব কোন সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন—"The proud old man does not condescend to accept the praise of Europeans"—তথাপি সে সময়ে জাতির রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষা ভিন্নরূপ ছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে নূতন আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি হয়। তখন 'বন্দে মাতরম্' পত্রে ভারতবাসীর রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ প্রকাশিত হয়—"absolute autonomy free from foreign control." তখন হইতে বাঙ্গালা নাটকে নূতন ভাবে পরাধীনতার জন্য বেদনা প্রকাশ পায়; যাঁহারা মুসলমান বা ইংরেজ শাসকদিগের ক্ষমতা নষ্ট করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন, প্রশংসার বর্ণে তাঁহাদিগকে চিত্রিত করা হয়; স্বাধীনতা-লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা হয়—ইত্যাদি। সেই বিষয়ের আগ্রহে যাহাকে "the fashion of rehabilitating the outcasts of popular opinion" বলা হয়, তাহাও দেখা যায়। গিরিশচন্দ্রের কয়খানি নাটকও দেশাত্মবোধে পূর্ণ।

সে ভাব সময়োপযোগী। দেশ তখন স্বাধীনতা-লাভের জন্য আগ্রহশীল; দেশ ইংরেজের শোষণে শীর্ণ, তাহার শাসনে পীড়িত। সেই জন্যই বিহারীলাল সরকারের এবং তদপেক্ষাও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'অন্ধকূপ-হত্যা'র বিবরণের অসারত্ব-প্রমাণ লোকের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার বহুদিন পূর্ব্বে ভোলানাথ চন্দ্র যখন সে কথা বলিয়াছিলেন, তখন তাহা লোকের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট করে নাই। অনুরূপ কারণেই ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে—আয়ার্লণ্ডে "বয়কট" শব্দের উদ্ভব হইবারও পূর্ব্বে—ভোলানাথ যখন বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন সে কথা কেহ শুনে নাই; কিন্তু ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পরে, যখন বিদেশী পণ্য-বর্জ্জন কেবল অর্থনীতিক নহে, পরন্তু রাজনীতিক অস্ত্ররূপেও ব্যবহৃত হয়, তখন তাহার জন্য দেশ আগ্রহে মাতিয়া উঠিয়াছিল। ভোলানাথ লিখিয়াছিলেন :—

"Without using any physical force, without incurring any disloyalty, without praying for any legislative succour, it is quite in our power to regain our lost position. It would be no crime for us to take the only but most effectual weapon—moral hostility—left us in our last extremity. Let us make use of this potent weapon by resolving to non-consume the goods of England."

এই কথা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত হইয়াছিল; আর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতীয় কংগ্রেস—ক্ষতি স্বীকার করিয়াও (even at a sacrifice)—স্বদেশী দ্রব্য-ব্যবহারে সম্মতি দেন নাই। সে নির্দ্দেশও কেবল খণ্ডিত বাঙ্গালার জন্য।

দেশ প্রস্তুত হইয়া ছিল বলিয়াই দেশাত্মবোধ-দ্যোতক নাটকের আদর হয়। সেরূপ নাটকের সংখ্যাও যে অল্প নহে ও সে সকল নাটক যে লোকপ্রিয় হইয়াছে এবং সেই আদরের জন্য বিদেশী শাসকদিগের রোষভাজন হইয়াছে, তাহাতেই দেশের লোকের মনোভাব ও দেশের লোকের সহিত বিদেশী শাসকদিগের সম্পর্ক বুঝিতে পারা যায়।

কোন কোন মহিলাও নাটক-রচনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন এবং কোন কোন মুসলমান লেখক যে নাটক রচনা করিয়াছেন তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

সমসাময়িক ঘটনা সামান্য হইলেও তাহা অবলম্বন করিয়া বহু নাটক ও প্রহসন রচিত হইয়াছিল। তারকেশ্বরের মোহান্ত মাধব গিরির মামলা লইয়া যেমন তেমনই আটাশ জন কমিশনারের কলিকাতা কর্পোরেশন ত্যাগ লইয়া লেখকগণ নাটক বা প্রহসন রচনা করিয়াছেন।

সমসাময়িক ব্যাপার লইয়া আরও এক প্রকার নাটক রচিত হইয়াছিল। সে সকলের মধ্যে "জনৈক ডাক্তার প্রণীত" 'ডাক্তার বাবু নাটক' (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ) উল্লেখযোগ্য। ইহার লেখক—

ভুবনমোহন সরকার। তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর রচনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

সেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদে বাঙ্গালার কয়জন প্রসিদ্ধ লেখকও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন—কবি হেমচন্দ্র 'টেমপেষ্ট' ও 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'জুলিয়াস সীজার' এবং গিরিশচন্দ্র 'ম্যাকবেথ' নাটক অনুবাদ করেন। কবি নবীনচন্দ্র 'মিডসামার নাইটস্ ড্রীম' অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ডক্টর দুর্গাদাস করের দ্বিতীয় পুত্র সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা রাধামাধব করের 'বসন্তকুমারী' (১৮৭০ খৃষ্টাব্দ) সেক্সপীয়রের 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েটে'র মর্ম্মানুবাদ।

ইংরেজী উপন্যাসের আখ্যানবস্তু লইয়াও বহু নাটক রচিত হইয়াছিল। সে সকলের মধ্যে ডক্টর দুর্গাদাস করের তৃতীয় পুত্র রাধারমণ করের 'সরোজা' নাটকখানি রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছিল। উহার আখ্যানবস্তু মিসেস হেনরী উডের প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'ইষ্ট লীন' হইতে গৃহীত হইয়াছিল।

হরিশ্চন্দ্র হালদারের 'কালাপাহাড়' (১৮৮১ খৃষ্টাব্দ) ও 'বেদবতী বা পতিপ্রাণা' (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ) এক কারণে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু ও শিল্পী ছিলেন। ১২৯২ বঙ্গাব্দে মাসিক পত্র 'বালক' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। উহাতে চিত্র থাকিত। তখন হাফটোন চলন হয় নাই। 'বালকে' প্রকাশিত চিত্রগুলি লিথোগ্রাফ। সেগুলির শিল্পী হরিশ্চন্দ্র হালদার। প্রথম চিত্রখানির নিম্নে লিখিত ছিল—By H. C. Halder, Printer and Lithographer। 'বালকে' প্রতিভাসুন্দরী দেবীর রচিত "গান অভ্যাস" প্রবন্ধে 'বন্দে মাতরমে'র প্রথম সাত ছত্রের স্বরলিপি প্রকাশিত হয় :—

"বন্দে মাতরং !
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরং !

শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীং
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরং।"

তাহার সঙ্গে বহুসন্তান-পরিবেষ্টিতা মাতার চিত্র ছিল। চিত্রের নিম্নে লিখিত ছিল—By Harish Chandra Halder.

এক একখানি নাটকের নাম দীর্ঘ—যথা নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'ভারতের সুখশশী যবন-কবলে' (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ)।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বরিশাল হইতে 'ভারত বন্দিনী' নাটক প্রকাশিত হয়। তাহার লেখক—মনোরঞ্জন গুহ। ইনি কি মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ?

'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রণেতা দুর্গাচরণ রায়ও নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার 'দুঃখনিশি অবসান বা শৈলবালা' নাটক বাস্তব-চিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্য-পরিচায়ক।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সকল উপন্যাস নাটকে পরিণত করা হইয়াছিল এবং সেই কার্য্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ অগ্রণী ছিলেন। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস সমসাময়িক মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের সুখদুঃখের চিত্রে লোককে মুগ্ধ করে। ফিলিপ্‌স তাঁহার 'কপালকুণ্ডলা'র ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় এই উপন্যাসের অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন এবং সে প্রশংসা অতিরঞ্জিত নহে। সেই উপন্যাস নাটকে রূপান্তরিত করিয়া 'সরলা' নামে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তাহার গদাধরচন্দ্র—যিনি "ড়ুড ও টামাক দু'ইই" খাইতেন, সেই "গডা ডর চন্দ" যেমন বহুদিন বাঙ্গালী দর্শকের হাসির উপকরণ যোগাইয়াছে,—সরলার দুঃখে তেমনই দর্শকগণ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

এইরূপে বহু সাধকের সাধনায় বাঙ্গালা নাটক—গঙ্গা যেমন বহু শাখানদীর সলিলে পুষ্ট হইয়াছে তেমনই পুষ্ট হইয়াছে ; বহু ভক্ত

যেমন বিশ্বনাথের জন্য অর্ঘ্য আনয়ন করেন, তেমনই বহু সাহিত্যিক বঙ্গভারতীর জন্য নাটকার্ঘ্য আনিয়াছেন। যতদিন বাঙ্গালা সাহিত্য থাকিবে, ততদিন যেমন সাধকের প্রয়োজন শেষ হইবে না, তেমনই সাধকদিগের সাধনার সিদ্ধিতে বাঙ্গালা নাটক পরিপুষ্টির পথে অগ্রসর হইবে, সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা নাটক এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া যাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগের দুঃখ আন্তরিক হইলেও তাঁহারা impatient idealists; তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—বাঙ্গালা নাটকের আরম্ভ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে—সে সময় হইতে এখনও এক শতাব্দী কাল উত্তীর্ণ হয় নাই। বিদেশী শাসকদিগের অবজ্ঞা এবং দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবহেলার মধ্য দিয়া তাহার যে বিকাশ হইয়াছে, তাহা উষ্ণপ্রধান প্রাচীর-তরুলতার দ্রুত পুষ্টির সহিত তুলনা করিলে অসঙ্গত হয় না।

সে বিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌরভ ও সৌন্দর্য্য স্মরণ করিলে সহজেই মনে হয়—যেন—

"ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে॥"

যাঁহাদিগের অক্লান্ত সাধনায় বাঙ্গালা নাটক পুষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদিগের তুলনায় সমালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই—সে কার্য্য শোভনও হইতে পারে না। সে বিষয়ে মতভেদও যে অনিবার্য্য তাহা বলা বাহুল্য। লেখকদিগের রচনা-সম্বন্ধে যেমন, অন্য সকল বিষয়েও তেমনই মতভেদ থাকিবেই। সেই জন্যই—

পুষ্পেষু জাতির্নগরেষু কাঞ্চী
নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুঃ।
নদীষু গঙ্গা নৃপতৌ চ রামঃ
কাব্যেষু মাঘঃ কবিকালিদাসঃ॥

এই প্রচলিত মতও সর্ব্বসম্মত নহে।

অভাবের অনুভূতিই অভাব দূর করিবার প্রেরণার কারণ। সেইজন্য বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের পূর্ণতার অভাববোধ ভবিষ্যতে পূর্ণতাসাধনে সহায় বলিয়াই আমরা সেই অভাববোধে নূতন আশার অরুণোদয় লক্ষ্য করিতেছি।

যাঁহারা বাঙ্গালা নাটকের জন্য সাধনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি—তাঁহাদিগকে

> "যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
> রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে।"

৪

গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল

বাঙ্গালার রঙ্গালয়ের অভিব্যক্তির ইতিহাসের সহিত গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাম যেরূপ জড়িত সেরূপ আর কাহারও নহে। তিনি একাধারে অভিনেতা, নাট্যাচার্য্য ও নাটক-লেখকরূপে দীর্ঘকাল খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন—তখন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডক্টর সুকুমার সেন লিখিয়াছেন—"গিরিশচন্দ্রের নাট্য-রচনাশক্তির প্রেরণা আসে, তাঁহার অভিনয়-দক্ষতা হইতে। নটখ্যাতি সুদৃঢ় হইবার অনেক কাল পরে ইনি অভিনয়ের প্রয়োজনে নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হন।" গিরিশচন্দ্র কবিতা ও গান রচনা করিতেন এবং ইংরেজী কবিতার বঙ্গানুবাদ করিতেন—এ কথা দেবেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন। কবিতা ও গান রচনা-শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকারী। অক্ষরের মাপ রাখিয়া ভাব-প্রকাশ করিতে হইলে একদিকে যেমন ভাব-প্রকাশ-সংযম শিক্ষা হয়, অপর দিকে তেমনই ভাষার উপর অধিকার-বিস্তার হয়। গানে সুরের জন্য রচনা সংযত ও সংহত করিতে হয়। আর অনুবাদে ভাষার উপর অধিকার আরও বৰ্দ্ধিত হয়। আট বৎসর ঐরূপ সাধনার পরে গিরিশচন্দ্র বাগবাজারে সখের দলে 'শর্ম্মিষ্ঠা' পালায় কয়খানি গান রচনা করিয়া দেন। এই দল হইতে অভিনেতা নির্ব্বাচিত করিয়া যখন "বাগবাজার এমেচার থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন গিরিশচন্দ্র তাহার উদ্যোক্তৃগণের মধ্যে ছিলেন এবং সেই রঙ্গালয়ে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' অভিনীত হইলে—তিনি নিমচাঁদের ভূমিকা অভিনয় করেন। সেই অভিনয়ে তাঁহার অসাধারণ অভিনয়নৈপুণ্য প্রকাশ পায়—

"মদমত্ত পদ টলে নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে
প্রথম দেখিল বঙ্গ নব নটগুরু তার।"

উত্তরকালে ‘বৌঠাকুরাণীর হাটে’র অভিনয়ে রাধামাধব করের বসন্ত রায়ের ভূমিকা অভিনয় দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছিলেন—তিনি বসন্ত রায়ে যে কল্পিত চিত্র ভাষায় ফুটাইতে পারেন নাই, রাধামাধব বাবু অভিনয়ে তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন—তেমনই দীনবন্ধু গিরিশচন্দ্রের নিমচাঁদ অভিনয় দেখিয়া বলিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে তাঁহার নিমচাঁদ প্রকৃত নিমচাঁদ হইয়াছিল। ইহার পরে ঐ সখের রঙ্গালয়ে দীনবন্ধুর ‘লীলাবতী’ নাটক অভিনীত হয়। তাহাতে গিরিশচন্দ্র ললিতের অংশ অভিনয় করেন।

এই সময় কলিকাতায় পেশাদারী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ‘নীলদর্পণ’ অভিনীত হইল। গিরিশচন্দ্র তাহাতে যোগ দিলেন না; কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল—“আমাদের যেরূপ সাজ-সরঞ্জাম তা’তে উপহাসাস্পদ হ’তে হবে।” কিন্তু রাজহংস যদি কখন মনে করে, সে আর কখন জলে নামিবে না, তবে তাহার সে সঙ্কল্প যেমন স্থায়ী হয় না, গিরিশচন্দ্রের পেশাদার রঙ্গালয়ে যোগদান না করিবার সঙ্কল্প তেমনই স্থায়ী হইল না। রঙ্গালয়ে ‘কৃষ্ণকুমারী নাটকে’র অভিনয়ে তিনি অবৈতনিকভাবে যোগ দিয়া ভীমসিংহের ভূমিকা অভিনয় করিলেন। ইহার পরে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইল এবং গিরিশচন্দ্র তাহাতে অভিনয়ের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের ‘মৃণালিনী’ ও ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাস দুইখানি নাটকে রূপান্তরিত করিলেন। ইহার পরে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আরও কয়খানি উপন্যাস—‘বিষবৃক্ষ’, ‘দুর্গেশনন্দিনী’, ‘সীতারাম’, রমেশচন্দ্র দত্তের ‘মাধবী-কঙ্কণ’ উপন্যাস, মধুসূদনের ‘মেঘনাদ-বধ’ কাব্য, নবীনচন্দ্রের ‘পলাশীর যুদ্ধ’ কাব্য, দীনবন্ধুর ‘যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ’ নক্সা নাটকে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত অধ্যয়ন-প্রিয় ছিলেন। সেই জন্য তাঁহার ভ্রাতার নিকটে কোন বন্ধুপ্রদত্ত এডউইন আর্নল্ডের Light of Asia পাঠ করিয়া তিনি তাহা অবলম্বন করিয়া ‘বুদ্ধদেব’ রচনা করেন।

তিনি সেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের যে বঙ্গানুবাদ করেন, তাহাতে মূলের ভাব সুরক্ষিত হওয়ায় তাহা সুধীসমাজে প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইংরেজীতে সুলেখক নগেন্দ্রনাথ ঘোষও তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। নাটক-রচনায় গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা যেন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত না। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রতাপচাঁদ জুহুরীর ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দিয়া তিনি ঐ রঙ্গালয়ের জন্য পনরখানি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন—'মায়া-কানন', 'মোহিনী প্রতিমা', 'আলাদীন', 'আনন্দ রহো', 'রাবণ-বধ', 'সীতার বনবাস', 'অভিমন্যু-বধ', 'লক্ষ্মণ-বর্জ্জন', 'সীতার বিবাহ', 'ব্রজবিহার', 'রামের বনবাস', 'সীতা-হরণ', 'ভোটমঙ্গল', 'মণিমালা' ও 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'।

এই সকল হইতেই বুঝিতে পারা যায়, গিরিশচন্দ্র তখনও কোন্ পথে সমধিক সাফল্য লাভ করা যায়, তাহার পরীক্ষা করিতেছিলেন, এবং পৌরাণিক নাটক-রচনায় অধিক অবহিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার প্রতিভার বিকাশ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মন্মথনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন—"অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন যে, তিনি একবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যাঁহার নাটকাবলী সমগ্র দেশবাসী কর্ত্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত ও সমাদৃত, তিনি কেন নাটক-রচনা সহসা পরিত্যাগ করিলেন? উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেন—'নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্র প্রবেশ করিয়াছেন আমার নাটক-রচনার আর প্রয়োজন নাই।'" জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দূরদর্শনের পরিচয়ে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে (১৮ই জানুয়ারী) রোম হইতে তরুণ শিল্পী মিলেকে লিখিত থ্যাকারের পত্রের কথা মনে পড়ে—"Millias my boy, I have met in Rome a versatile young dog called Leighton, who will one of these days run you hard for the Presidentship (of the Royal Academy)."

'রাবণ-বধ' (১২৮৮ বঙ্গাব্দ) গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক নাটক। ইহার বৈশিষ্ট্য ইহা আদ্যন্ত ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। এই ছন্দ তাঁহার পূর্ব্বে কোন কোন লেখক ব্যবহার করিয়া থাকিলেও তিনিই তাহার সংস্কার ও অধিক প্রচলন করেন এবং ইহা "গৈরিশ ছন্দ" নামে পরিচিত হয়। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দকে বিদ্রূপ করিয়া যেমন সে সময় অনেক রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তেমনই গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটক যখন অভিনয়ের আয়োজন হইতেছে, কিন্তু পাছে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গালয় ঐ নামে কোন নাটক মঞ্চস্থ করেন, এই আশঙ্কায়, তাহার নাম প্রকাশ করা হয় নাই, তখন—কোন সূত্রে উহা অবগত হইয়া—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কোন সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন :—

"ভাই রে গিরিশ,
বাহিরিবে কবে তব 'জনা' ?
জান না—জান না
কত যে কামনা
হেরিবারে নাচুনী কুঁদুনী !"

এই ছন্দের মনোহারিত্ব বক্তার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

গিরিশচন্দ্রের 'সীতার বনবাস' দর্শকদিগের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল।

'চৈতন্যলীলা'র (প্রথম অভিনয়—১৯শে শ্রাবণ, ১২৯১ বঙ্গাব্দ) অভিনয় বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে যেমন নূতন ভাবের ধারা প্রবাহিত করে—তেমনই হিন্দু সমাজকে যেন মাতাইয়া তুলিয়াছিল। 'চৈতন্যলীলা'র গানগুলি রঙ্গালয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমগ্র বাঙ্গালায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—সুদূর পল্লীগ্রামেও অশিক্ষিত কৃষকদিগের মুখে সেগুলি শুনিতে পাওয়া যাইত এবং পরে রসিক চক্রবর্ত্তী তাঁহার "বালক কীর্ত্তনে" গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা'র অনেকগুলি গানের

অনুকরণে গান রচনা করেন; স্থানে স্থানে কেবল কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল—"চন্দ্রকিরণ অঙ্গে নমো বামনরূপধারী"র স্থানে—"ইন্দুবরণ অঙ্গ নমো গৌরাঙ্গ দণ্ডধারী।"

এই 'চৈতন্যলীলা' কিরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহা যাঁহারা তাহার প্রথম অভিনয়-কালের লোক নহেন, তাঁহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। নবদ্বীপের তখনও "ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ" খ্যাতির অবশেষ ছিল। সেই নবদ্বীপ চৈতন্যের বাল্যলীলাক্ষেত্র বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়রা যেমন গর্ব্বানুভব করিতেন, বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ তেমনই তীর্থস্থান বলিয়া বিবেচনা করিতেন—তাঁহাদিগের নিকট বৃন্দাবনের রজ অতি পবিত্র—

"ধূলা নয় এ বালু নয়—এ গোপীর পদরেণু
এই রজ শিরে ধরে নন্দের সুত কানু"

নবদ্বীপের স্থান বৃন্দাবনের পরেই। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মত বিষয়ী লোকও জীবনের সায়াহ্নে নবদ্বীপবাসী হইয়াছিলেন। যখন 'চৈতন্যলীলা' অভিনীত হয়, তখনও নবদ্বীপে বহু টোল—বহু পণ্ডিত; আবার তথায় কীর্ত্তনানন্দ। মণিপুরের রাজ-পরিবারের তথায় বাসব্যবস্থা ছিল। সেই নবদ্বীপের পণ্ডিত মহাশয়রা 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখিয়া গ্রন্থকারকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। সে সময়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রভাব অসাধারণ; কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ব্রাহ্ম সমাজে নেতৃস্থানীয় ও বিদেশে যশস্বী,—তাঁহারাও তাঁহার আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেই রামকৃষ্ণও 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দেখিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন।

এই নাটকে প্রথমেই চৈতন্যকে অবতার বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। সেই সময় হইতে গিরিশচন্দ্রের রচনায় নূতন ভাবের বিকাশ। দেবেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন:—

"প্রতিভা কোন একটি বিশেষ তত্ত্ব ও বার্ত্তা প্রচারের জন্য অবতীর্ণ

হয়। প্রেমতত্ত্ব প্রচার ছিল গিরিশচন্দ্রের বিশেষত্ব। কি পার্থিব, কি ঐশী প্রেম তাঁহার লেখনী সমভাবে চিত্রিত করিয়াছে। * * * শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, বীর, করুণ ও হাস্যরস স্ফুরণে, অন্তর্দ্বন্দ্বের বিকাশে, নাটকীয় সংস্থান (situation) এবং ঘটনার সৃষ্টিতে ও চরিত্র-সৃষ্টিতে তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল। প্রেম-ভক্তি-ভালবাসা, ত্যাগ-বিবেক-বৈরাগ্য প্রভৃতির চিত্রবিকাশ ছিল তাঁহার নাটকের প্রধান লক্ষ্য।"

গিরিশচন্দ্রের নাটকে নানা চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 'জনা'য় পিতা নীলধ্বজ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে পরাভব অনিবার্য্য জানিয়া পুত্র প্রবীরকে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব ধরিবার পরে ছাড়িয়া দিতে বলিলে পুত্র মাতা জনার নিকটে আসিয়া বলিল :—

"রণমৃত্যু হতে কিবা আছে, মা, কল্যাণ ?
কে কোথায় ক্ষত্রিয়-রমণী
সন্তানে অঞ্চলে ঢাকি' রাখে ?
কুলাঙ্গার পুত্র কা'র বাঞ্ছনা, জননি ?
ক্ষত্রিয়-নন্দিনী কা'র ভীরু পুত্র সাধ ?"

জনা পুত্রের যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প সমর্থন করিলেন; স্বামীকে বলিলেন :—

"ক্ষত্রোচিত গৌরব ইচ্ছায়
পুত্রবর চায় রণে যেতে,
পরাজিতে দাম্ভিক অরিকে।
মন্দ যদি তায় কভু হয়, নরনাথ,
না করিব বিন্দু অশ্রুপাত,
প্রফুল্ল নয়নে
নন্দনে হেরিব রণস্থলে।"

অরবিন্দ মহাভারতীয় একটি কাহিনী অবলম্বন করিয়া—তাহাকে "a peculiar contemporaneous urgency" দিয়া ক্ষত্রিয় জননীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বিদুলা বিধবা, তাঁহার পুত্র সঞ্জয় সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াও আপনার দৌর্ব্বল্যহেতু শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে অসম্মত। পুত্রের মনোভাব কাপুরুষোচিত মনে করিয়া বিদুলা পত্রকে যুদ্ধে প্রেরণা দিতেছেন :—

"Son," she cried, "no son of mine to make
thy mother's heart rejoice.
Hark, thy foemen mock and triumph, yet to
live is still thy choice,
Nor thy hero father got thee, nor I bore thee
in my womb,
Random changeling from some world of
petty souls and coward gloom ! . . . . . .
Out to battle, do thy man's work, falter not
in high attempt ;
So a man is quit before his God and saved
from self-contempt . . . .
Sunjoy, Sunjoy waste not thou thy
flame in smoke ! Impetuous, dire,
Leap upon thy foes for havoc as a famished
lion leaps,
Storming through thy vanquished victors till
thou fall on slaughtered heaps."

গিরিশচন্দ্রের জনা পুত্রহারা হইয়া—স্বামীর সান্ত্বনাবাক্যের উত্তরে বলিয়াছিলেন :—

"আরে রে অর্জ্জুন,

* * * *

দেখি তোরে কে তারে, পামর !

যাই, রাজা, কাল বয়ে যায়,
প্রতিবিধিৎসার—কাল বহে!
চলে জনা প্রতিবিধিৎসিতে।"

এইরূপ উক্তিতে লোক নাটকের বহু ত্রুটি উপেক্ষা করে।

বঙ্কিমচন্দ্র, কমলাকান্তরূপে, অধ্যাপক ব্রাহ্মণদিগকে সংসারের ধুতুরা ফল বলিয়াছেন। ধুতুরা মাদকতা বৃদ্ধি করে—"প্রবন্ধ গাঁজার মধ্যে বচন-ধুতুরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে।" তেমনই গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকে মধ্যে মধ্যে যে সকল উক্তি দিতেন—সে সকল দর্শকের নেশা "জমাইয়া" তুলে। এইরূপ উক্তির প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করিতেন। তাহার কারণও—একাধিক।

তাঁহার ভক্তিরসাত্মক নাটকগুলিতে অতিপ্রাকৃতের প্রাবল্য আছে—তাহা বর্ত্তমান সময়ের সংশয়বাদীদিগের প্রীতি অর্জ্জন করিতে পারে না। কারণ, "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর।" এ কথা নূতন নহে। সেই জন্যই ইংরেজ কবি টেনিশন তাঁহার In Memorium কাব্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন:—

"Strong Son of God, immortal Love,
Whom we, that have not seen thy face,
By faith and faith alone embrace,
Believing where we cannot prove."

কিন্তু মানুষ অনেকেই সংশয়বাদী। সেইজন্য সেরূপ ভাবের ভাবুক হওয়া অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই সম্ভব নহে। সেই কারণেই মানুষ মানুষ। ভক্তি মানুষকে যে অবস্থায় লইয়া যাইতে পারে, সে অবস্থা অসম্ভব নহে—কিন্তু সহজলভ্যও নহে। সেই "জন্যই রাধাভাব" সকলের জন্য নহে। সেই ভাবের অভিব্যক্তি দাশরথির একটি গানেও আমরা পাই—বৈষ্ণব কবিদিগের রচনার ত কথাই নাই—

"ব্রজগোপী নেত্র যেন ভ্রমরার পাঁতি,
কৃষ্ণমুখনীলপদ্মে পড়ে মাতি মাতি।"

দাশরথির গান জনসাধারণের জন্য লিখিত। শিক্ষিত অপেক্ষা অশিক্ষিতরাই অধিক সংখ্যায় পাঁচালি শুনিতেন—তাঁহার ছড়া ও গানের সমজদার ছিলেন। গানটি এইরূপ :—

"ননদিনি, বলো নগরে
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে ॥
কাজ কি বাসে, কাজ কি বাসে ?
কাজ কেবল সেই পীতবাসে ;
সে যার হৃদয় বাসে
সে কি বাসে বাস করে ?
কাজ কি গো কুল, কাজ কি গোকুল ?
গোকুলের সব হ'ক প্রতিকুল—
আমি ত সঁপেছি গো কুল
অকূলের কাণ্ডারীর করে।"

সেই অবস্থা যখন হয়, তখনই অসম্ভব সম্ভব হয়—নহিলে নহে। যে "প্রেমসায়রের" জন্য নীলকণ্ঠ আকুল-হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"কবে বৃন্দাবনের প্রতি কূলি কূলি
ঘুরিয়ে বেড়াব স্কন্ধে লয়ে ঝুলি ;
কণ্ঠ ভ'রে, পিব করপুটে তুলি—
অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম যমুনার ?"

সে প্রেম সহজলভ্য নহে। সেই জন্য তাহা সকলের কামনার বস্তুও হইতে পারে না। গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ ভক্তিরসাত্মক নাটক কেবল সেই প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া রচিত নহে, পরন্তু তাঁহার অধিকাংশ পৌরাণিক নাটকেও তাহার সঞ্চারচেষ্টা সপ্রকাশ। 'বুদ্ধদেব চরিতে' তাহা যে সাধারণ দর্শকের অপ্রীতিকর হয় নাই, তাহার কারণ, জয়দেব গৌতম বুদ্ধকেও—"আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধজগৎ

ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর"—তাঁহাকে দশাবতারের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন—লিখিয়াছিলেন—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়-দর্শিতপশুঘাতম্
কেশব ধৃত-বুদ্ধ-শরীর
জয় জগদীশ হরে।"

গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাত্মক নাটক 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'ও অতি-প্রাকৃত ঘটনায় পূর্ণ।

গিরিশচন্দ্র গার্হস্থ্য নাটকও রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে সকলে বাঙ্গালীর—মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের সুখ ও দুঃখ—বিশেষ দুঃখ এবং সমস্যা চিত্রিত হইয়াছে। সে সকলের মধ্যে প্রথম নাটক 'প্রফুল্ল' (প্রথম অভিনয়—১২৯৮ বঙ্গাব্দ)। 'প্রফুল্ল' শ্রেষ্ঠ ও সম্পূর্ণাঙ্গ বিষাদান্ত নাটক। দেবেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—"মর্ম্মভেদী করুণ-রসাত্মক" নাটকে—"যেন তাঁহার জীবনের ট্র্যাজিডি......হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে।" এই ট্র্যাজিডি কেবল গিরিশচন্দ্রের জীবনেরই নহে—বাঙ্গালীর বহু পরিবারের বক্ষের উপর দিয়া ইহার রথচক্র নির্ম্মম ভাবে চলিয়া গিয়াছে—অস্থিপঞ্জর চূর্ণ করিয়াছে। ইহাতে কোন কোন স্থানে অতিরঞ্জন থাকা অসম্ভব নহে—তাহা বেদনা তীব্রতর করিবার জন্য piling up agony on agony. সে বেদনা বাঙ্গালীর সংসারে চিরন্তনী বলিলেও বলা যায়। তাহার কারণ, সমাজের অনেক প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনও সহজে সাধিত হয় নাই। কারণ, এ দেশে বিদেশীর ধর্ম্ম ও প্রথা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য হিন্দুকে কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রক্ষণশীলতার কমঠকঠোর আবরণে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। আর সমাজের শৃঙ্খলা যেমন শিথিল হইয়াছিল, তেমনই সমাজপতির স্থান কেহ অধিকার করিতে পারেন নাই। সেই জন্য সমাজে আবশ্যক পরিবর্ত্তন-প্রবর্ত্তন সহজসাধ্য

হয় নাই—ব্যক্তিগত চেষ্টা হইয়াছে, সমাজগত চেষ্টা হয় নাই। কিন্তু দেখা যায়, ইংরেজ এ দেশে প্রাধান্যলাভের সময়েও কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র উজানিয়া গোপ-সম্প্রদায়কে "জলচল" করিয়াছিলেন। বল্লাল সেনের কথা বহু পূর্ব্বের। সমাজগত চেষ্টার অভাবেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত লোকের সমাজের সামান্য সংস্কার-চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে তাঁহার রাজনীতিক মতের ক্রমপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায়, (দ্বিতীয় বার) কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। অধিবেশনের স্থান 'টিভলি গার্ডেন'—লোয়ার সার্কুলার রোড। তাহার দক্ষিণে তখন ধান্যক্ষেত্র। তথায় এখন সৌধমালা ধান্যক্ষেত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে—তাহারই মধ্য দিয়া ল্যান্সডাউন রোড গিয়াছে। সেই অধিবেশন উপলক্ষে গিরিশচন্দ্র 'মহাপূজা' রূপক রচনা করেন এবং তাহা ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। কংগ্রেসে সমবেত প্রতিনিধিরা তাহা দর্শনের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বৃটেনের রাণী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশে লিখিয়াছিলেন,—

"তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু—
শিখিনি শিং বাঁকান—
* * * *
কেবল খাব খৈল বিচিলি ঘাস
আমরা ভূষী পেলেই খুসী হব
ঘুঁসী খেলে বাঁচব না।"

তাহা ব্যঙ্গ। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নাটকে বৃটেনেশ্বরীর ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসার উত্তরে লক্ষ্মী বলিয়াছেন :—

"ব্যাপিয়া বিশাল রাজ্য, হের, সতি, মম কার্য্য
লক্ষ লক্ষ অট্টালিকা নেহার সম্মুখে,
শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র হেরে কৃষি হাসিমুখে।

জিনিয়ে মেঘের ধ্বনি শুন শুন, সুবদনি,
গর্জ্জি ধায় বাণিজ্য-বাহন ধুমযান ;
বাণিজ্যের কলরব শুনহ প্রমাণ ॥
—ইত্যাদি

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী 'ভারতগাথা' নামে কবিতায় ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে ছিল—ইংরেজের শাসনে—

"শুভ্র গঙ্গা বহি যায় রক্তবিন্দু নাহি তায়,
সুনীল যমুনা নিরমল।
দেখিলে জুড়ায় নেত্র স্বর্ণকান্তি শস্যক্ষেত্র—
আগে যেথা ছিল রণস্থল।"

গিরিশচন্দ্র কেবল দুঃখ করিয়াছিলেন, ভারতবাসীরা
"শিল্পকার্য্যে নিয়োজিত করিল না কর।"

আর সেই জন্যই তাহারা বস্ত্রের, দীপশলাকার—এমন কি লবণের জন্যও বৃটেনের মুখাপেক্ষী। এ বিষয়ে মনোমোহন বসুর আক্ষেপোক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।—

"ছুঁই সূতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে ;
দীয়াশলাই কাঠি, তাও আসে পোতে
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।"

মনে রাখিতে হইবে তখন ভারতবাসীর—

"আবেদন আর নিবেদনের থালা
বহে বহে নতশির।"

তখনও স্বরাজের স্বপ্ন "রাজদ্রোহাত্মক" বলিয়া শাসকদিগের মত।—যে ''absolute autonomy free from foreign control'' আমরা আজও লক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করি, তাহার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

লর্ড মিণ্টো ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ আন্দোলন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"An awakening wave which is sweeping over the Eastern world, overwhelming old traditions and bearing on its crest a flood of new ideas..."

গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই সেই ভাব-পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। মেম্‌ননের মূর্ত্তি হইতে, অরুণ-কিরণপাতে, স্বরলহরী নির্গত হয়—এই জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া লর্ড ডাফরিন বলিয়াছিলেন, পরিবর্ত্তিত অবস্থার আলোক-প্রভাব মিশরের কৃষকদিগকেও প্রভাবিত করিয়াছে—"The fellah like his own Memnon had not remained irresponsive to the beams of the new dawn." তেমনই "স্বদেশী আন্দোলন" নামে পরিচিত যে স্বাধীনতা-আন্দোলন বাঙ্গালার গোমুখী-মুখ হইতে নির্গত হইয়া সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার পবিত্র স্পর্শ গিরিশচন্দ্র লাভ করিয়াছিলেন; এবং তাহারই ফলে তিনি 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীর কাসিম', ও 'ছত্রপতি' নাটকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। নাটক কয়খানি দেশাত্মবোধদ্যোতক।

গিরিশচন্দ্রের এই ঐতিহাসিক নাটক কয়খানিতে ইংরেজের সহিত সিরাজদ্দৌলার ও মীর কাসিমের দ্বন্দ্ব এবং ঔরঙ্গজেবের সহিত শিবাজীর দ্বন্দ্ব আখ্যানবস্তুর কেন্দ্র। সিরাজদ্দৌলা ও মীর কাসিম আপনাদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য ইংরেজের সহিত—বাধ্য হইয়া—যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শিবাজী ঔরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন—বাধ্য হইয়া নহে, জাতির কল্যাণ-কামনায়। শিবাজী দেশাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। আমরা অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ প্রভেদ ভুলিয়া যাই—ভুল করি। সিরাজদ্দৌলার ধাতুতে বীরের বৈশিষ্ট্য ছিল না; মীর কাসিম নবাব হইয়া বিদেশী বণিক ইংরেজের শোষণ শেষ করিয়া আপনি

লাভবান হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিবাজীর পতাকা—সন্ন্যাসীর গৈরিকবর্ণ—তাহা ভোগের নহে—ত্যাগের প্রতীক।

সিরাজদ্দৌলা বা মীর কাসিম ইংরেজকে পরাভূত করিলে সমগ্র দেশের কি লাভ হইত, তাহা অনুমান করা দুষ্কর। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"সিপাহী বিদ্রোহ যদি সফল হইত, তবে আজ দিল্লীতে মুসলমান বাদসাহ এবং লক্ষ্ণৌয়ে মুসলমান বাদসাহ রাজ্য করিত।" হিন্দুর কি লাভ হইত ? অথচ হিন্দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দুর লাঞ্ছনার চিহ্ন ত কাশীতে, মথুরায়, বৃন্দাবনে—নানাস্থানে প্রকট। অবশ্য এক সম্প্রদায়ের লোক মনে করে—

"রাজপদে মন্ত্রিপদে আছি বিরাজিত ;
অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও সমুচিত।"

সেরূপ লোক মুসলমানের শাসন-সময়ে যেমন ইংরেজের শাসন-কালেও তেমনই এ দেশে পাওয়া গিয়াছে। সেই জন্যই ষড়যন্ত্র করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে বিতাড়িত করিয়া বিদেশী ভিন্নধর্ম্মী ইংরেজকে প্রাধান্যদানের চেষ্টা করায় অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী মহারাণী ভবানী সেই সম্প্রদায়ের প্রতীকরূপ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে—"শাঁখা ও শাড়ী" পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

যে সময়ে দেশে স্বাধীনতা-লাভের জন্য আন্দোলন চলিতেছিল এবং বাঙ্গালার তরুণরা সে জন্য অনায়াসে হাসিমুখে প্রাণ দিতেছিল, সে সময়ে গিরিশচন্দ্রের দেশাত্মবোধাত্মক নাটকগুলি আদৃত হইবারই কথা। কারণ, তখন ইংরেজবিদ্বেষ দেশে প্রবল—একদিকে স্বাধীনতা-লাভের প্রয়াস, আর একদিকে সেই প্রয়াস নষ্ট করিবার জন্য স্বৈরশাসনের সকল অস্ত্র-প্রয়োগ। কারণ, বিদেশী শাসকদিগের মত, সেইরূপ প্রয়াস—crime of nationalism. আমাদিগের মনে হয়, সিরাজদ্দৌলা ও মীর কাসিম এত অল্পদিন পূর্ব্বের লোক যে, তাঁহাদিগকে লইয়া রচিত নাটকে প্রচুর কল্পনা-প্রয়োগের অবসর অল্প।

গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ঐ সকল দেশাত্মবোধাত্মক নাটক-রচনার সঙ্গে সঙ্গে যেমন সামাজিক নাটক 'শাস্তি কি শান্তি' রচনা করিয়াছিলেন, তেমনই আবার 'শঙ্করাচার্য্য', 'অশোক' ও 'তপোবল' রচনা করিয়াছিলেন। 'তপোবল' বারাণসীতে রচিত হয়। তখন গিরিশচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের লিখিত নাটকের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ।

গিরিশচন্দ্রের রচনার বিচারকালে একটি বিষয় বিস্মৃত হইলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে—তিনি রঙ্গালয়ে যে দর্শক-সম্প্রদায়ের জন্য নাটক রচনা করিয়া রঙ্গালয়ের আয়-বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সে সম্প্রদায়ের "রসবোধের পরিধি তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না"। সেই জন্য তাঁহাকে স্থানে স্থানে লঘুতার অবতারণা করিতে হইত—হয়ত প্রতিভার সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ করিতে হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে চরিত্রের বৈচিত্র্য ও সংখ্যা অসাধারণ ও বিস্ময়কররূপ অধিক।

ডক্টর সুকুমার সেন যথার্থ ই বলিয়াছেন—পূর্ব্বগামীদিগের নিকট গিরিশচন্দ্রের ঋণ অধিক নহে; কিন্তু তাঁহার নিকট পরগামীদিগের ঋণ অত্যন্ত অধিক। তিনি বাঙ্গালার রঙ্গালয়ে যেমন বাঙ্গালা নাটকেও তেমনই যুগপ্রবর্ত্তক।

গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক, কিন্তু কিছু পরবর্ত্তী বিখ্যাত নাটক-লেখক—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'সুরধুনী কাব্যে', কৃষ্ণনগর বর্ণনায়, যাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

> "কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান,
> সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য, বিদ্বান;
> সুমধুর স্বরে গীত কিবা গান তিনি—
> ইচ্ছা করে শুনি হয়ে উজান-বাহিনী"

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি পিতার বহু গুণের উত্তরাধি-

কারী হইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমে অনেক গীত রচনা করেন। কলিকাতায় পাঠ শেষ করিয়া বৃত্তি লইয়া তিনি কৃষিবিদ্যা-শিক্ষার্থ বৃটেনে গমন করেন। তিনি যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তাঁহার ভ্রাতারা—তাঁহার য়ুরোপ-গমনের জন্য—তাঁহাকে পৈত্রিক গৃহে বাস করিতে দিতে অসম্মত হইয়া তাঁহার বাসজন্য সেই গৃহের সংলগ্ন বিস্তৃত ভূমিতে এক স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া রাখেন। দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রুষ্ট হইয়া উঠেন—তাঁহার সেই রোষ 'একঘরে' গদ্য রচনায় প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিলেন, কিন্তু ইংরেজ সরকার তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরী দিলেন।

হাসির গানে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার হাস্যরসপ্রধান কবিতাগুলিও উপভোগ্য।

মনে আছে, ১৩০১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রে যখন তাঁহার "কেরানী" কবিতা প্রকাশিত হয়, তখন, লেখকের নামোল্লেখ না থাকায়, কিরূপ আগ্রহ সহকারে তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সেই কবিতার শেষ :—

"খেটে খেটে খেটে—
যে ক' দিন বাকি আছে, তাও যাবে কেটে' ;
বিধাতার আদালতে পরকালে গিয়ে
উত্তর দেবার আছে,—'দিই তিন মেয়ের বিয়ে ;
তাহাই আমার ধর্ম্ম।
তাহাই আমার কর্ম্ম,
বিয়ে দিতে দিতে প্রায় কেটে গেছে জন্ম ;
আর নিজে দুই বিয়ে করে ফুরিয়ে গেল 'প্রমায়' ;
আর কিছু করিবার পাইনিক সময়।''

কবিতাটি হাস্যরসে পূর্ণ হইলেও তাহাতে অন্তর্নিহিত বেদনার

আর্ত্তনাদ সপ্রকাশ—হাসির সঙ্গে অশ্রু মিশ্রিত হয়। পড়িলে ইংরেজ কবি হুডের The Song of the Shirt মনে পড়ে :—

"Work—work—work !
Till the brain begins to swim ;
Work—work—work
Till the eyes are heavy and dim !
Seam, and gusset, and band,
Band, and gusset, and seam,
Till over the buttons I fall asleep
And sew them on in a dream."

গান ও কবিতা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদিগের আলোচনা-সীমান্তর্গত নহে। সেই জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের—

"জান না কি কদাচন মূঢ়
কর্ণবিমর্দ্দন-মর্ম্ম কি গূঢ়।"

প্রভৃতি কবিতা লইয়া যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিব না।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম প্রহসন 'কল্কি অবতার', লইয়া দেখা দেন। তাঁহার পরবর্ত্তী প্রহসন—'বিরহ'। তাঁহার হাসির গান এই সকল রচনাকে সরস করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি রামায়ণের ভাণ্ডার হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দুইখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন—'পাষাণী' অমিত্রাক্ষর ছন্দে, 'সীতা' মিত্রাক্ষরে। 'সীতায়' গান নাই। ইহা রচনা হিসাবে উৎকৃষ্ট।

তিনি সামাজিক নাটকও লিখিয়াছিলেন—'পরপারে' (১৩১৯ বঙ্গাব্দে), আর 'বঙ্গনারী'। 'বঙ্গনারী' তাঁহার অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। তাঁহার 'তারাবাই' নাটকের আখ্যানবস্তু রাজস্থান হইতে সংগৃহীত। 'সোরাব ও রুস্তমে' গানের প্রাচুর্য্য।

প্রাচীন কাহিনী লইয়া তিনি 'সিংহল-বিজয়' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' রচনা করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত ব্যতীত তাঁহার মোগল ও রাজপুত ইতিহাস অবলম্বন করিয়া রচিত নাটক—'প্রতাপ সিংহ', 'দুর্গাদাস,' 'নুরজাহান', 'মেবার-পতন' ও 'সাজাহান' বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলির "উৎসর্গে" বৈশিষ্ট্য আছে—তাহা পূজ্যদিগের উদ্দেশে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য-নিবেদন :—

(১) 'সাজাহানে'র উৎসর্গ—"মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে এই সামান্য নাটকখানি উৎসর্গীকৃত হইল।"

(২) 'চন্দ্রগুপ্তে'র উৎসর্গপত্র—"কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্দেশে এই নাটকখানি উৎসৃষ্ট হইল।"

(৩) 'মেবার-পতনে'র উৎসর্গ—"যিনি মহাকাব্যে, খণ্ডকাব্যে, ও গীতিকাব্যে বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর আনিয়া দিয়া গিয়াছেন; যিনি ভাবে, ছন্দে, উপমায়, চরিত্রাঙ্কণে দীনা বঙ্গভাষাকে অপূর্ব্ব অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন; যিনি বিদ্যাবত্তায়, প্রতিভায়, মনীষায় বঙ্গসন্তানের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, সেই অমৃত-প্রভাব, অক্ষয়-কীর্ত্তি, অমর—৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাকবির উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি গ্রন্থকার কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত হইল।"

(৪) 'নুরজাহানে'র উৎসর্গ—"বঙ্গসাহিত্যের গুরু, হিন্দুর হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠাতা, প্রাজ্ঞ, মনীষী, দেশভক্ত, স্বধর্ম্মব্রত, ভারতের গৌরব ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সি. আই. ই.র পুণ্য স্মৃতি উদ্দেশে এই নূরজাহান নাটক উৎসর্গীকৃত হইল।"

(৫) 'দুর্গাদাসে'র উৎসর্গ—"যাঁহার দেব-চরিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমি এই দুর্গাদাস-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, সেই চিরারাধ্য পিতৃদেব ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় দেবশর্ম্মার চরণকমলে এই ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম।"

(৬) 'পরপারে'র উৎসর্গ—"পূজ্যপাদ প্রসাদদাস গোস্বামী দাদা-মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু।" প্রসাদদাস দ্বিজেন্দ্রলালের পত্নী সুরবালা দেবীর, মাতৃদেবীর সম্পর্কে, "দাদামহাশয়"। ইনি দ্বিজেন্দ্রলালের নিত্যসঙ্গী ও শুভার্থী ছিলেন। ইঁহার সাহিত্য-রসিকতাও যথেষ্ট ছিল এবং ইনি দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধুদিগেরও "দাদামহাশয়" ছিলেন।

যিনি এইরূপ শ্রদ্ধাবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বিশেষভাবে বন্ধুবৎসল ছিলেন, তিনি যে 'আনন্দ বিদায়ে' রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিয়া-ছিলেন, তাহাতে কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনার প্রশংসাও করিয়াছিলেন। সে সময়ে "সাহিত্য সমাজ" নামে একটি সাহিত্যিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রধানতঃ 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির যত্নে তাহা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। ইণ্ডিয়া ক্লাবে ও কোন কোন সদস্যের গৃহে—বিশেষ সুরেশবাবুর গৃহে, তাহার অধিবেশন হইত। সুরেশচন্দ্র, 'রায় মহাশয়'-লেখক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সখারাম গণেশ দেউস্কর, চুনীলাল গুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি তাহার সদস্য ছিলেন। একাধিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েই উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং উভয়ের গানে আসর 'মশগুল' থাকিত। আর গায়ক ছিলেন—কেদারনাথ মিত্র; তিনি একদিন "ওগো এত প্রেম-আশা প্রাণের তিয়াসা"—গানটি গাহিবার পর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—"কেদার বাবুর গানের পরে আমার গাহিতে লজ্জা হইতেছে।" লক্ষ্য করিবার বিষয়, আপনার মত তীব্র—কখন কখন অতিরিক্ত তীব্র—ভাবে প্রকাশ করিবার অভ্যাস দ্বিজেন্দ্রলালের ছিল। তিনি একটি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রকেও আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং 'আনন্দমঠে' বে-শেলাই শাড়ী-পরিহিতা শান্তির পুরুষের মত অশ্বারোহণ "বিকৃতমস্তিষ্কে"র

কল্পনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সেই উক্তির অশিষ্টতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই মতান্তর মনান্তরের কারণ হয় নাই। 'একঘরে'র তীব্র আক্রমণে আমরা প্রথমে সেই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই বলিয়াছেন—"ইহার ভাষা ঠাট্টার ভাষা নহে। ইহার ভাষা অন্যায়ক্ষুব্ধ তরবারির বিদ্রোহী ঝনৎকার, ইহার ভাষা পদদলিত ভুজঙ্গমের ক্রুদ্ধ দংশন, ইহার ভাষা অগ্নিদাহের জ্বালা।" রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'ও তাঁহার তীব্র আক্রমণের বিষয় হইয়াছিল।

বোধ হয়, কবিদিগের স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতা এই তীব্রতার কারণ। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা রবীন্দ্রনাথে যত পাই, তত আর কোন বাঙ্গালী কবিতে নহে। তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"মাইকেল ভাবিলেন, মহাকাব্য লিখিতে হইলে গোড়ায় সরস্বতীর বর্ণনা (বন্দনা ?) করা আবশ্যক, কারণ হোমর তাহাই করিয়াছেন, অমনি সরস্বতীর বন্দনা শুরু করিলেন। মাইকেল জানেন, অনেক মহাকাব্যে স্বর্গ-নরক-বর্ণনা আছে, অমনি জোরজবরদস্তি করিয়া কোন প্রকারে কায়ক্লেশে অতি সঙ্কীর্ণ, অতি বস্তুগত, অতি পার্থিব, অতি বীভৎস এক স্বর্গ-নরক-বর্ণনার অবতারণা করিলেন। মাইকেল জানেন, কোন কোন বিখ্যাত মহাকাব্যে পদে পদে স্তূপাকার উপমার ছড়াছড়ি দেখা যায়, অমনি তিনি তাঁহার কাতর পীড়িত কল্পনার কাছ হইতে টানা-হেঁচড়া করিয়া দীন দরিদ্র উপমা ছিঁড়িয়া আনিয়া একত্র জোড়াতাড়া লাগাইয়াছেন। * * দেখিলাম তাহার ('মেঘনাদবধের') প্রাণ নাই। দেখিলাম, তাহা মহাকাব্যই নয়।"

তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"আমাদের দেশের প্রধান লেখক, প্রকাশ্যভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে, অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন; সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন * * * * আমাদের শিরার

মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত, তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন ?"

তিনি সভায় "গান্ধারীর আবেদন" পাঠ-কালে ভূমিকায় তাঁহার কোন তরুণ সমালোচককে বলিয়াছিলেন—"কাঁচা বাঁশে বাঁশী হয়, লাঠি হয় না; বদ্ধাঞ্জলি হইলে বিনয় প্রকাশ করা হয়—কিন্তু বদ্ধাঞ্জলি না হইলে রস গ্রহণ করা যায় না; জন্মিবামাত্র কাকা হওয়া যায়, জ্যেঠা হওয়া যায় না"—ইত্যাদি।

তিনি তাঁহার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে যাঁহারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য বোলপুরে গিয়াছিলেন, সেই অতিথিদিগকে উপলক্ষ করিয়া যাঁহারা তাঁহার কবিতার গুণগ্রাহী নহেন, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

এ সব কবির oversensitiveness. দ্বিজেন্দ্রলালেরও তাহা ছিল।

মধুসূদনের প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছি, 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা-কালেই তিনি মুসলমান পাত্র-পাত্রী লইয়া বাঙ্গালায় নাটক-রচনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিত পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

"We ought to take up Indo-Mussulman subjects. The Mahomedans are a *fiercer* race than ourselves, and would afford splendid opportunity for the display of passion. Their women are more cut out for intrigue than ours."

প্রথমেই সুলতানা রিজিয়ার কথা মধুসূদনের মনে পড়িয়াছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনি সেই অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল মুসলমান পাত্র-পাত্রী লইয়া বহু নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়েও বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রণী—তবে উপন্যাসে। তিনি লিখিয়ছিলেন—"বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর

দেশ নহে।” অবশ্য এ কথা বিভক্ত ভারতে ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাচেষ্টার পূর্ব্বের। সমগ্র অখণ্ড ভারতবর্ষের কথায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—“হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না।” তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক উপন্যাস ব্যতীত প্রায় অন্য সকল উপন্যাসেই মুসলমান চরিত্র আছে। তাঁহার আয়েষা ও দলনী চরিত্র লক্ষ্য করিয়াও যে কোন কোন হিন্দুদ্বেষী মুসলমান তাঁহাকে মুসলমানদ্বেষী বলিয়াছেন, তাহার কারণ, বোধ হয়, মধুসূদন যাহা বলিয়াছেন—“they are a fiercer race than ourselves” এবং উগ্রতা—বিশেষ অকারণ উগ্রতা—অধিকাংশ স্থলে বিচার-বুদ্ধি বিকৃত করে। এই উগ্রতার সঙ্গে আবার অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম্মান্ধতা মিলিত হইত এবং ধর্ম্মান্ধতা কেবল স্বধর্ম্মনিষ্ঠতায় নিবদ্ধ না থাকিয়া পরধর্ম্মদ্বেষে আত্মপ্রকাশ করিত।

সে যাহাই হউক, কেবল উগ্রতাই ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের কার্য্যে দেখা যায় নাই; কারণ এ কথাও সত্য যে, ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ—“the fat maggots and creeping parasites that breed in the warm comfort of a royal religion.” বিলাস ও স্বার্থপরতা নানারূপ ষড়যন্ত্রের উদ্ভব করিত—পিতা পুত্রকে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না, পুত্রও ক্ষমতালাভের জন্য পিতাকে বন্দী করিতে বা পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। সেই সকল ষড়যন্ত্রে পুরাঙ্গনারাও যোগ দিতেন—সাহজাহানের এক কন্যা জাহান আরা ভ্রাতা দারার সমর্থক, অন্য কন্যা রোশন আরা ঔরঙ্গজেবের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

“দিল্লী মহানগরীর সারভূত দিল্লীর দুর্গ; দুর্গের সারভূত রাজপ্রাসাদমালা। এই রাজপ্রাসাদমালার ভিতর অল্পভূমিমধ্যে যত ধনরাশি, রত্নরাশি এবং পাপরাশি ছিল, সমস্ত ভারতবর্ষে তাহা

ছিল না। রাজপ্রাসাদমালার সারভূত অন্তঃপুর বা রঙ্‌মহাল। ইহা কুবের ও কন্দর্পের রাজ্য। * * * এত ভোগবিলাস জগতে আর কোথাও নাই। এত মহাপাপ আর কোথাও নাই।"

কৌতূহলী পাঠক বার্ণিয়ার, টাভার্ণিয়ার, মেনুসী প্রভৃতি পর্য্যটক-দিগের বিবরণে ইহার প্রমাণ পাইবেন।

ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা নাটকের আখ্যানবস্তু ও উপকরণ দানের পক্ষে যথেষ্ট বলা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল, বোধ হয় নাটকের প্রয়োজন বুঝিয়া, মুসলমান পাত্র-পাত্রী অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান' নাটকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের, 'সাজাহান' নাটকে সম্রাট সাহজাহানের এবং 'দুর্গাদাস' নাটকে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময়ের ঘটনাসৃষ্টি। ঘটনার স্থান—আগ্রা ও দিল্লী—নাটকের সাজসজ্জার পক্ষে লোভনীয়।

'নূরজাহান' নাটকে নূরজাহানের চরিত্র যেভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে 'কপালকুণ্ডলা'য় বঙ্কিমচন্দ্রের অঙ্কিত চিত্র মনে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র সামান্য কয়টি রেখায় সে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। লুৎফ-উন্নিসা আপনার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া শের আফগানের পত্নী মেহের-উন্নিসার মনোভাব জানিতে বর্দ্ধমানে আসিয়াছিল—"মেহের উন্নিসার চিত্ত জাহাঁগীরের প্রতি কিরূপ? তাহার যেরূপ দার্ঢ্য তাহাতে যদি সে জাহাঁগীরের প্রতি অনুরাগিণী না হইয়া স্বামীর প্রতি যথার্থ স্নেহশালিনী হইয়া থাকে, তবে জাহাঁগীর শত শের-আফগান বধ করিলেও মেহের-উন্নিসাকে পাইবেন না। আর যদি মেহের-উন্নিসা জাহাঁগীরের যথার্থ অভিলাষিণী হয়, তবে আর কোন ভরসা নাই।" আকবরের মৃত্যু ও জাহাঙ্গীরের সিংহাসন-লাভের সংবাদ শুনিয়া মেহের-উন্নিসা (জাহাঙ্গীরের অঙ্কশায়িনী হইবার পরে নূরজাহান) আর মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া বলিয়াছিল—"সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে—আমি কোথায়?" সে স্বামীকে

ভালবাসে নাই—তাহার অসামান্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ মত্তপ চঞ্চলচিত্ত জাহাঙ্গীরকে লাভ করিয়া বাদশাহের মহিষী হইবে এই আকাঙ্ক্ষাই তাহার মনে ছিল। সেই জন্য সে জাহাঙ্গীরকে ভালবাসে নাই। তাহার কার্য্যের প্রেরণা—দরিদ্রের কন্যা সে—পথে তাহার জন্ম—সে ভারতের সম্রাজ্ঞী হইবে। জাহাঙ্গীর তাহার রূপে মুগ্ধ—সে যেন মত্তপের পানাসক্তি। তাই জাহাঙ্গীর শের আফগানকে হত্যা করিয়া তাহার স্ত্রী মেহেরকে পাইতে কৃতসঙ্কল্প। তাহার উক্তি :—

"জানি, এ ঘোর অন্যায়—ভয়ানক অবিচার। তবু শের খাঁকে মর্ত্তে হবে। আমি তাকে বলেছিলাম, তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ ক'রে আমায় দিতে। তাতে সে বীরের মতই উত্তর দিয়েছিল। তবু তারই জন্য তাকে মর্ত্তে হবে। যখন বিকার হয় তখন অতিস্বাদু হিতকর জিনিষও বমন হয়ে যায়। ন্যায় অন্যায় বিচার বহু দূরে সরে গিয়েছে। হিতাহিত-বিবেচনা-শক্তি আর আমার নাই। তাকে মর্ত্তে হবে।"

যে এত হীন তাহাকে ভালবাসা—পতিহন্তাকে ভালবাসা ভালবাসার অপমান। নূরজাহান বলিয়াছিল, জাহাঙ্গীরের সম্বন্ধে তাহার মনোভাব—"তাকে আসক্তি বলে না।—সে একটা উদ্দাম প্রবৃত্তি। হয়ত উচ্চাশা—হয়ত অহঙ্কার। কিন্তু আসক্তি নয়।" আর সেই উচ্চাশার জন্যই সে 'পোষা হরিণীর মত' পতিহন্তার প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার মনের কথা—"নূরজাহান দেবী নয়। নূরজাহান রাজত্ব কর্ত্তে বসেছে, রাজত্ব কর্ব্বে। সে আর কারো প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করবে না।"

জাহাঙ্গীর লালসা পরিতৃপ্তির জন্য শের আফগানকে হত্যা করিয়া তাহার স্ত্রীকে অনিয়াছিল। নূরজাহান রূপের রজ্জুতে সম্রাটকে বদ্ধ করিয়া রাজত্ব করিতে চাহিয়াছিল।

যে ধাতুতে সেক্সপীয়র লেডী ম্যাকবেথ গঠন করিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল সেই ধাতুতে নূরজাহান গঠিত করিয়াছিলেন।

নূরজাহানের শেষ অবস্থা—সেই—"Here's the smell of the blood still ; all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. oh, oh, oh !"

অসম্ভব—

To "minister to a mind diseas'd ;
Pluck from the memory a rooted sorrow ;
Raze out the written troubles of the brain ;
And with some sweet oblivious antidote
Cleanse the stuffed bosom of that perilous stuff
Which weighs upon the heart."

নাটকে একদিকে ক্ষমতালোভে মত্ত নূরজাহান, আর এক দিকে রেবা—"আমরা হিন্দুজাতি, বিলিয়ে দিতেই জন্মেছি। * * আমাদের আশা এখানে নয় * * আমাদের আশা ভরসা (উৰ্দ্ধে দেখাইয়া) ঐখানে।" জড়বাদ-জর্জ্জরিত সভ্যতার কলুষস্পর্শ যাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না—ইহকাল-সর্বস্ব আকাঙ্ক্ষার প্রলোভন যাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না, এ উক্তি তাহারাই করিতে পারে। তাহারাই ঘটনা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে হৃদয়ে ধর্ম্মের শিখা প্রজ্জ্বলিত রাখিতে পারে—

"যথা অগ্নিহোত্র দ্বিজ দীপ্ত রাখে অগ্নি নিজ,
চিরদীপ্ত রহে হুতাশন।"

তাহারাই জানে, ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা আদরের, আর "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

'নূরজাহান' নাটকে লেখকের অতি যত্নসহকারে সেক্সপীয়রের নাটক পাঠের পরিচয় সপ্রকাশ।

'সাজাহান' নাটকে বিলাসী বৃদ্ধ সম্রাটের পুত্রস্নেহ আর সর্পের মত ভয়ানক পুত্র ঔরঙ্গজেবের দুর্নিবার নিষ্ঠুরতা ও ভণ্ডামী ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহজাহানের—স্নেহশীল পিতার চিত্রের পার্শ্বে

ঔরঙ্গজেবের—পাপী পুত্রের চিত্র যেন উজ্জ্বল আলোকের পার্শ্বে ঘন অন্ধকার।

'সাজাহানে' ঐতিহাসিক ঘটনা বিপর্য্যস্ত নহে এবং সেই জন্যই তাহাতে ঘটনার বাহুল্য। পুঞ্জীভূত ঘটনা পুঞ্জীভূত বেদনায় দর্শককে অভিভূত করে।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল অভিনয়ের জন্য যত নাটক রচনা করিতেন—পাঠের জন্য তত নহে। তাঁহাকে মনে রাখিতে হইত— অতি সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত নর-নারী অভিনয়দর্শন করিতে আসিবে। সাহিত্য যাহারা তাহার মূল্য টাকা আনা পাই হিসাবে দেয় তাহাদিগের রসবোধের স্তরে আসিয়া থাকে। পুস্তকাগারে বসিয়া সুধীরা যে সে নাটক পাঠ করিবেন, এমন মনে করিবার কারণ ছিল না। বিশেষ রাজনীতিক মত ব্যাপ্ত করা নাটকের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল। সেই জন্য নাটকে লঘু ভাবের অবতারণাও করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু অনেক উচ্চাঙ্গের উক্তি ও গান উচ্চ ভাবের দ্বারা সকল দৈন্য পরাভূত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। মহামায়ার আদেশে চারণীদিগের গান তাহার দৃষ্টান্ত—

সেথা গিয়াছেন তিনি সমরে, আনিতে জয়গৌরব জিনি
সেথা গিয়াছেন তিনি মহা আহ্বানে—
মায়ের চরণে প্রাণ বলিদানে ;
মথিতে অমর মরণ-সিন্ধু আজি গিয়াছেন তিনি।
সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির ;
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।"

আইরিশ কবি মুরের কবিতা অপেক্ষা ইহার গৌরব অধিক— কারণ ইহাতে আপনার স্বার্থচিন্তা নাই—

"Go where glory waits thee ;
But while fame elates thee
Oh ! still remember me."

গানের—

সেথা বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি হয়,
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়—
ভ্রূকুটির সহ গর্জ্জন মিশে—রক্ত রক্ত সনে"

যেন—

"Back from the Comradeship of Death
Free from the Friendship of the Sword."

" 'দুর্গাদাসে' উচ্ছ্বসিত দেশপ্রেমের উপর চরিত্রবলের প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে।" 'দুর্গাদাসে'র প্রথম অঙ্কে যখন যোধপুর মহিষীর মোগল-বাহিনী ভেদ করিয়া গমনের কথায় মোগল সেনাপতি দিলীর— ঔরঙ্গজেবের সম্মুখে বলিলেন—

"যখন সেই নারী মোগল-সৈন্যব্যূহের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন—নিরবগুণ্ঠনা, আলুলায়িতকেশা, বক্ষে সুপ্ত কন্যা—তখন মহারাণীর আড়াই শ' সৈন্য আড়াই লক্ষ বোধ হ'ল। সেই মোগল-সৈন্য কৃষ্ণমেঘের উপর দিয়ে তিনি বিদ্যুতের মত এসে চলে গেলেন। কেউ তাঁকে স্পর্শ কর্ত্তে সাহস কর্লে না। আমি দূরে দাঁড়িয়ে সে অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি দেখলাম। বল্‌তে চেষ্টা কর্লাম—'ধর যশোবন্তের রাণীকে' —কণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল। তরবারি খুলতে চেষ্টা কর্লাম—তরবারি উঠলো না। * * * দেখলাম সে এক মহিমময় দৃশ্য। * * * নির্ম্মেঘ ঊষার চেয়ে নির্ম্মল, বীণার ঝঙ্কারের মত সঙ্গীতময়, ঈশ্বরের নামের চেয়ে পবিত্র—সেই মাতৃমূর্ত্তি।"

তখনই মুগ্ধ শ্রোতারা উদ্রিক্ত কৌতূহলে ঘটনার স্রোতের সম্বন্ধে সতর্ক হইল।

গুলনেয়ার দলিতা ফণিনী—আপনার বিষে আপনাকেই জর্জ্জরিত করিয়াছিল। দুর্গাদাস কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া সে কামবক্সকে বলিয়াছিল :—

"যতদিন আমি সম্রাজ্ঞী হয়ে ছিলাম, ততদিন বেঁচে ছিলাম।

যতদিন শাসন ক'রে এসেছিলাম,—বেঁচে ছিলাম। যতদিন মাথা উঁচু ক'রে গর্ব্বে থাক্‌তে পেরেছিলাম—বেঁচে ছিলাম।"

সে স্বামী ঔরঙ্গজেবকে বলিয়াছিল—"সম্রাজ্ঞী হ'য়ে দিগন্তরেখায় উঠেছিলুম, সম্রাজ্ঞী হয়ে দিগন্তরেখায় অস্ত যাচ্ছি।"

দুর্গাদাস কেবল দেশমাতৃকার ভক্ত সন্তান নহেন, তিনি পূতচরিত্র। তাই তিনি মোগল সম্রাজ্ঞীর প্রেম-নিবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন—

"পরদারকে আমরা রাজপুত জাতি মাতা বলে জানি। আপনার মর্য্যাদা আপনি না রাখেন, আমি রাখবো।"

এই দুর্গাদাস—দেশমাতৃকার ভক্ত সন্তান বীর দুর্গাদাস যখন যে লাঞ্ছনা বিজাতি বিধর্ম্মী শত্রুর কাছে সহ্য করেন নাই সেই লাঞ্ছনা স্বজাতি স্বধর্ম্মী হিন্দুর হাতে ভোগ করিলেন, যখন দেখিলেন, হিন্দু হিন্দুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার হীন স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিতেছে, তখন তাঁহার সকল আশা শেষ হইল। শেষে যখন তিনি ভগ্নহৃদয়ে বলিলেন—"ব্যর্থ হয়েছি। পার্লেম না এ জাতিকে টেনে তুলতে। মোগল সাম্রাজ্য থাকবে না বটে, কিন্তু এ জাতি আর উঠবে না"—তখন যেন মর্ম্মবেদনার হাহাকারে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। সে বেদনা সমগ্র দেশের—সমগ্র জাতির; কেন না, তাহার শেষ কোথায়? এ হাহাকারের তুলনায় সিজারের শেষ উক্তি—"*Et tu Brute?* Then fall Caesar!" দুর্ব্বল—কারণ, তাহা ব্যক্তির—জাতির নহে।

তবে জাতিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া গৌরবের জয়মাল্যে ভূষিত করিতে হইলে দুর্গাদাসের আদর্শের প্রয়োজন।

দ্বিজেন্দ্রলাল কেন হিন্দুরাজত্বকালীন ঘটনা লইয়া লিখিত 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক লিখিবার পূর্ব্বে "মুসলমানকাল সম্বন্ধেই" নাটক লিখিয়াছিলেন, তাহার কারণ তিনি 'চন্দ্রগুপ্তে'র ভূমিকায় ব্যক্ত করিয়াছেন:—

"মুসলমান ইতিহাসকারগণ নিজের পরাজয়গুলি গোপন করিলেও নাটক লিখিবার যথেষ্ট উপকরণ রাখিয়া গিয়াছেন। হিন্দু ইতিহাস-কারগণ আপনাদের বিজয়-কাহিনী পর্য্যন্ত গোপন করিয়াছেন।"

ইহার কারণও বঙ্কিমচন্দ্র বুঝাইয়াছেন—যে কারণেই হউক, জগতের যাবতীয় কর্ম্ম দৈবানুকম্পায় সাধিত হয়, ইহাই প্রাচীন কালের হিন্দু-দিগের বিশ্বাস ছিল। "মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহে, অতএব মনুষ্যের কীর্ত্তিবর্ণনে প্রয়োজন নাই। এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি অস্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ।"

দ্বিজেন্দ্রলাল্ লিখিয়াছেন—"ইতিহাস হইতে বিশেষ কোন সাহায্য পাই নাই। অনন্যোপায় হইয়া কল্পনার উপরেই অধিক নির্ভর করিয়াছি।" সেই জন্যই নাটকের ঘটনা যে সময়ের যদি প্রামাণ্য উপকরণের অভাবে সে সময়ের পরিবেষ্টনচিত্রে ত্রুটি থাকিয়া থাকে, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ থাকিতে পারে না। 'দুর্গাদাস' প্রভৃতি নাটকে যেমন হিন্দুর বাহুবলের ও নৈতিক বলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করাই লেখকের উদ্দেশ্য, তেমনই—"ভক্ত হিন্দুজাতি বর্ব্বর নয়,"—বন্দী সেলুকস্‌কে মুক্ত করিবার সময় চন্দ্রগুপ্তের এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করাই 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের উদ্দেশ্য। কালের "মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে" সেই কথাই ভাসিয়া আসিয়া হিন্দুকে তাহার ম্লান গৌরব উজ্জ্বল করিতে প্রণোদিত ও প্রোৎসাহিত করিতেছে। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের তাহাই মর্ম্মকথা।

'মেবার-পতন' দেশাত্মবোধাত্মক নাটক। তাহার শিক্ষা—বিভক্ত বিচ্ছিন্ন ভারতবাসীর জন্য—

"ছিন্ন-ভিন্ন হীনবল ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?"

মেবার—বীরত্বের ও দেশাত্মবোধের জন্য—বায়রনের ভাষায় "land of gods and godlike men" এবং তথায় "where'er

we tread, 'tis haunted, holy ground." সেই ভাব নাটক-খানির প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সত্যবতীর চারণীদলের গানে ব্যক্ত হইয়াছে :—

"মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর,
বিরাট দুঃখ দৈন্যে তাহার শৃঙ্গের সম অটল স্থির।
জ্বালিল যেখানে সেই দবাগ্নি সে রূপবহ্নি পদ্মিনীর,
ঝাঁপিয়া পড়িল সে মহা আহবে যবন-সৈন্য, ক্ষত্রবীর।
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্ত পতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছ-দর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর"

—ইত্যাদি।

ধর্ম্ম অন্তরের বস্তু—তাহাকে যখন ঘৃণার অবলম্বন করা হয়, তখন কেবল তাহার সম্ভ্রম-নাশই হয় না, পরন্তু তাহা—মধু যেমন বিকৃত হইলে বিষ হয় তেমনই—অনিষ্টকর হয়। এই মাপকাটিতে "উদার—অত্যুদার সনাতন" ধর্ম্ম মাপিবার চেষ্টা মহাবৎ-চরিত্রে করা হইয়াছে।

আর গোবিন্দ সিংহ মৃত্যুকালে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—দস্যু কে বা কাহারা—

"দস্যু আমি নই মহারাজ! দস্যু তোমরা। পরের রাজ্য লুঠ কর্ত্তে আমি যাই নাই—তোমরা এসেছ। মহাবৎ খাঁ! যাও, এখন উদয়পুরে যাও। আর কেউ তোমার গতিরোধ কর্ব্বে না। নিজের মা'কে ধ'রে মোগলের দাসী ক'রে দাও।"

তিনি আসিয়াছিলেন—নিশ্চয়মৃত্যু জানিয়া—স্বদেশের পরাধীনতার অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ জ্ঞানে—মৃত্যুর জন্য।—"আমার স্বাধীন মেবারকে যবনের পদদলিত দেখবার আগে আমি মর্ত্তে চাই।" ইহাই মেবারের শেষ বীরের উক্তি। এইরূপ বীররাই দেশের গৌরব। তাঁহারাই মনে করেন :—

"How can man die better
Than facing fearful odds,
For the ashes of his fathers,
And the temples of his Gods;
And for the tender mother
Who fondled him to rest,
And for the wife who nurses
His baby at her breast?"

আর তাঁহাদিগের বিশ্বাস :—

"Ev'n if freedom from this world is driven,
Despair not—at least we shall find her in heaven."

দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে' নাটকের সুর অনুরূপ। ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন—"ভারতীয় কবির চরম পরিণতি—ধর্ম্মে।" 'পলাশীর যুদ্ধে'র কবির প্রতিভার পরিণতি 'রৈবতক' প্রভৃতিতে—'বৃত্রসংহারের' কবির পরিণত বয়সের প্রার্থনা—

"গঙ্গে অঙ্কে তব অন্তে কি স্থান পাব
দেহ মিলাব মা গো তব পুণ্য তোয়ে।
ভ্রান্ত নিতান্ত মা দিও পদছায়া
তাপতপ্ত কায়া ষড়রিপুরঙ্গে।
সর্ব্বপাতকহরা গঙ্গে রুদ্রশেখরা
স্বর্গসরিদ্বরা লৈও মা সঙ্গে॥
বন্দে মাতর্গঙ্গে।"

দ্বিজেন্দ্রলালের ভক্ত-হৃদয়ের পরিচয়—

"পরিহরি ভব-সুখ-দুঃখ যখন, মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জল-কলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে—
মা ভাগীরথি, জাহ্নবি, সুরধুনি, কল-কল্লোলিনী গঙ্গে।"

আর পরিচয় গানে ঃ—

"আর কেন, মা, ডাকছ আমায়
এই যে এইছি তোমার কাছে,
নাও, মা, কোলে, দাও, মা, চুমা
এখন তোমার যত আছে।
সাঙ্গ হলো ধূলাখেলা হয়ে এল সন্ধ্যাবেলা,
ছুটে এলাম এই ভয়ে, মা,
এখন তোমায় হারাই পাছে।
আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে,
বাহু দিয়ে নাও, মা, ঘিরে
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি—
মা, তোমার ঐ বুকের মাঝে।
এবার যদি পেয়েছি, শ্যামা,
আর ত তোমায় ছাড়ব না, মা;
ও মা ঘরের ছেলে পরের কাছে
মায়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে?"

এ শ্যামা-মা'র আদরের ছেলে রামপ্রসাদের আকুতি—আমি সারাদিন খেলায় মত্ত ছিলাম—এখন

"প্রসাদ বলে ভবের খেলায়
যা' হ'বার তাই হল।
এখন সন্ধ্যা বেলায় কোলের ছেলে
ঘরে নিয়ে চল।"

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা যেমন দীর্ঘকাল বঙ্গভারতীর মন্দির আলোকিত করিয়া ছিল, তেমনই বঙ্গসাহিত্যের বহু বিভাগ তাহার আলোকপাতে উজ্জ্বল হইয়াছিল। তিনি নাটক-রচনার দ্বারাও বাঙ্গলা সাহিত্যের একটি বিভাগ পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাট্য-রচনাও নানারূপ—গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, প্রহসন, নাটক প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা'। তাহার রচনা ও তাঁহার পরিণত বয়সের নাট্য-রচনা ইহার মধ্যে যে অনতি-দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালার রঙ্গালয়ের যেমন পরিবর্তন সংসাধিত হয়, বাঙ্গালা নাটকেরও তেমনই পরিবর্তন হয়। সেই পরিবর্তন বেলগাছিয়ায় অভিনয় হইতে শান্তিনিকেতনে অভিনয়ে প্রকাশ পায়। মধ্যে ছিল—সাধারণ অর্থাৎ পেশাদারী রঙ্গালয় আর "সঙ্গীত সমাজ"। পেশাদার রঙ্গালয়ে যেমন, নাটক-রচনায় ও অভিনয়ে তেমনই গিরিশচন্দ্র ঘোষ বহু পরিবর্তন প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে অধ্যাপকের কায ত্যাগ করিয়া রঙ্গালয়ে আসিয়া শিশিরকুমার ভাদুড়ী আবার কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও রচনা-রীতিতে ও অভিনয়-রীতিতে বহু পরিবর্তন প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। সে সকল পরিবর্তন নাটকের ও অভিনয়ের প্রয়োজনে প্রবর্তিত হইয়াছিল।

'বাল্মীকি-প্রতিভা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম পুষ্ট নাটকীয় প্রতিভার পরিচায়ক 'প্রকৃতির পরিশোধ' (১২৯৩ বঙ্গাব্দ) নাটকের "সূচনা"য় লিখিয়াছেন :—

"জীবনের প্রথম বয়স কেটেছে বদ্ধঘরে নিঃসঙ্গ নির্জ্জনে। সন্ধ্যা সংগীত এবং প্রভাত সংগীত সেই অবরুদ্ধ আলোকের কবিতা। নিজের মনের ভাবনা নিজের মনের প্রাচীরের মধ্যে প্রতিহত হয়ে আলোড়িত।

"তার পরের অবস্থায় মনের মধ্যে মানুষের স্পর্শ লাগল, বাইরের হাওয়ায় জানলা গেল খুলে, উৎসুক মনের কাছে পৃথিবীর দৃশ্য খণ্ড খণ্ড চলচ্ছবির মতো দেখা দিতে লাগল। গুহাচরের মন তখন ঝুঁকল লোকালয়ের দিকে। তখনো বাইরের জগৎ সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি আবেগের বাষ্পপুঞ্জ থেকে। তবু দুঃস্বপ্নের মতো আপনার বাঁধন-জাল ছাড়াবার জন্যে জেগে উঠল বালকের আগ্রহ। * * * লেখনীর সেই নূতন বহির্মুখী প্রবৃত্তি তখন কেবল ভাবুকতার অস্পষ্টতার মধ্যে বন্ধন স্বীকার করলে না। বেদনার ভিতর দিয়ে ভাব-প্রকাশের প্রয়াসে সে শ্রান্ত, কল্পনার পথে সৃষ্টি করবার দিকে পড়েছে তার ঝোঁক। সেইপথে তার দ্বার প্রথম খুলেছিল বাল্মীকি-প্রতিভায়। যদিও তার উপকরণ গান নিয়ে কিন্তু তার প্রকৃতিই নাট্যীয়।"

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গীতিনাট্য 'কালমৃগয়া' (১২৮৯ বঙ্গাব্দ)। ইহার গানের স্বরলিপি ১২৯২ বঙ্গাব্দে 'বালকে' প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বরলিপি প্রতিভাসুন্দরী দেবীর রচনা।

রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে ও নাট্যে মিলিত।"

তিনি বলিয়াছেন —"ইহার বৈপরীত্যকে নাটক্যিক বলা যেতে পারে। এরই মাঝে মাঝে গানের রস এসে অনির্বচনীয়তার আভাস দিয়েছে। শেষ কথাটা এই দাঁড়াল শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতি ক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়।"

১২৯৫ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা' প্রকাশিত হয়। ইহা "নাট্যের সূত্রে গানের মালা * * * হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ।" 'মায়ার খেলা'র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখিত ছিল—"সখী-সমিতির মহিলা শিল্প মেলায় অভিনীত হইবার উপলক্ষে এই গ্রন্থ উক্ত সমিতি কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল। * * মাননীয়া শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধে এই নাট্য রচিত হয় এবং তাঁহাকেই সাদর উপহারস্বরূপ সমর্পণ করিলাম।"

শ্রীমতী সরলা রায় প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়ের পত্নী ছিলেন। "সখী-সমিতি" প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তিনি "কাশিয়া বাগান বাগানবাটী"তে বাস করিতেন। উহা কলিকাতার উল্টাডিঙ্গী পল্লীতে অবস্থিত ছিল। সমিতির কার্য্যালয় ঐ গৃহেই ছিল। সমিতি সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ 'ভারতী ও বালক' পত্রে (১২৯৮ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়, তাহাতে লিখিত হইয়াছিল :—

"কি ধনশালিনী, কি গৃহস্থপত্নী, কি কৃতবিদ্যা, কি অশিক্ষিতা, কি স্বদেশীয়া, কি বিদেশীয়া সম্ভ্রান্ত রমণীগণের সম্মিলন দ্বারা যাহাতে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হয় ও তাঁহারা একপ্রাণা হইয়া রমণী-স্বভাবসিদ্ধ পরোপকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে উদ্যমবতী হইতে পারেন এই অভিপ্রায়ে প্রায় ৫ বৎসর হইল সখী-সমিতি নামক একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বোধ করি অনেকেই জানেন। আর এই অন্তঃপুর-প্রথাযুক্ত বঙ্গদেশের পক্ষে এইরূপ সমিতির আবশ্যকতা ও উপকারিতা কেহই বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না।

"এইরূপ সম্মিলনে যে রুচির উৎকর্ষসাধন, ভাবের উৎকর্ষসাধন, পরিবারের প্রতি পরিবারের, সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রদায়ের অকারণ বিদ্বেষভাবের অপনয়নে মনের উদারতাবৃদ্ধি—সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকা বশতঃ মহিলাদিগের মধ্যে সাধারণতঃ যে গুণটির অভাব দেখা যায়—প্রভৃতি সুফল হইবে, এমন নহে, মহিলাজাতির

স্বাভাবিক দয়াবৃত্তি—যাহার জন্য মহিলাজাতির মহিলাত্ব,—তাঁহাদিগের গৌরব, তাহার বিকাশ সাধনে সংসারের প্রভূত উন্নতি সাধন হইবে।”—ইত্যাদি।

এই প্রবন্ধের উপসংহার:—

“দীনবৎসলা, রাণি, মহারাণি, বেগমগণ তোমরা এই সদনুষ্ঠানে মুক্তহস্ত হইয়া রমণী নামের মান রমণী-হৃদয়ের মাহাত্ম্য রক্ষা কর; আর করুণহৃদয় রাজা, মহারাজা, নবাব, জমীদারগণ ও সহৃদয় দেশবাসী নর-নারীগণ, তোমাদের যাহার যেমন সাধ্য এই সৎকার্য্যে দান করিয়া হিন্দুর দানশীল নাম রক্ষা কর। আমরা তোমাদের দেশের রমণী, ভিক্ষাপাত্র লইয়া তোমাদের দ্বারে দাঁড়াইয়াছি—রমণীর প্রতি সম্মান, রমণীর প্রতি করুণা প্রদর্শন করিয়া ভারতের অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন কর। আর বিদেশীয়গণ, তোমরা বিশ্বজনীন উদারতা-প্রভাবে বিদেশের প্রতি করুণা করিয়া স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধন কর। এই প্রার্থনা, করুণাময় জগদীশ্বর আমাদের এই মঙ্গল উদ্দেশ্য সফল করুন।”

এই সমিতির মেলার জন্য ‘মায়ার খেলা’ রচিত হইয়াছিল। ইহার অনেকগুলি গান মধুর।

ইহার পরে ১২৯৬ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের বিষাদান্ত পঞ্চাঙ্ক নাটক ‘রাজা ও রাণী’ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে উৎসর্গপত্র ছিল—“পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় দাদা মহাশয়ের শ্রীচরণ-কমলে এই গ্রন্থ উৎসৃষ্ট হইল।” পরে উৎসর্গে “পরম পূজনীয়” বর্জ্জিত হইয়াছিল।

এই নাটক যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন পুস্তক-সংলগ্ন একখণ্ড কাগজে ছাপা ছিল—ইহা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান ব্যতীত অন্যান্য পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। ইহার কারণ, গুরুদাস বাবু তাহার পূর্ব্বে একবার রবীন্দ্রনাথের পুস্তকগুলি অল্পমূল্যে বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনে তাহা ওজনে কয় সেরের অধিক তাহা

লিখিয়াছিলেন। তাহাতে রচনার গৌরবহানি করা গুরুদাসবাবুর অভিপ্রেত না হইলেও রবীন্দ্রনাথ তাহাতে বিরক্ত হইয়াছিলেন।

এই নাটকের প্রথম সংস্করণে "সূচনা" ছিল না। পরে তাহা লিখিত হয় :—

"একদিন বড়ো আকারে দেখা দিল একটি নাটক—'রাজা ও রাণী'। এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্ব্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসংগত। এই নাটকে যথার্থ নাট্যপরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দ্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দ্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।

"প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে রাজা ও রাণীর এক জায়গায় মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। এই তত্ত্বকেই যে সজ্ঞানে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে তা নয়, এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্য স্বত উদ্যত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত ক'রে আনলে সে আপনার রস আপনি যোগাতে পারে না। তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।

"এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
শুধু সুখ চলে যায়
এমনি মায়ার ছলনা।"

রবীন্দ্রনাথ নিপুণ সমালোচকের মত আপনার এই নাটকের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা স্বয়ং-সম্পূর্ণ। কেন যে নাটক হিসাবে 'রাজা ও রাণী' ব্যর্থ রচনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহা তিনি বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। লিরিকের টানে অসঙ্গত ভাবে ইলা ও

কুমারের উপসর্গ, আর কাব্যের প্লাবন, আর তৃতীয় দিকে নাট্য-কাহিনীতে সরসতা সঞ্চারের চেষ্টা—এই ত্র্যহস্পর্শে নাটকের নাটকত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—নাটক দুর্ব্বল হইয়াছে। লর্ড ডাফরিন লিখিয়াছিলেন—

"Whenever I have made a speech, I have had to consider at least two, and sometimes three, audiences at once, like the circus riders who have to stand on the backs of several galloping horses at once."

বক্তৃতায় তাহা সম্ভব হইতেও পারে, কিন্তু সাহিত্যে তাহা সৌন্দর্য্যহানিকর হয়।

'রাজা ও রাণী'র আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এত সুভাষিত আছে যে, কবির ক্ষমতায় বিস্মিত হইতে হয়। যথা—

১। "স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতেখানা,
তেজহীন ব্রাহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলস।"

২। "তুমি চাও
নখদন্ত ভাঙ্গা এক পোষা পুরোহিত।"

৩। "দীপ্ত সূর্য্য সহ্য হয়, তপ্ত বালি চেয়ে।"

৪। "বন্যা আনে
সেই নদী, সেই বায়ু ঝঞ্ঝা নিয়ে আসে।"

৫। "রমণী নিয়েছে টেনে রাজ কর্ণখানা।"

৬। "বরঞ্চ আপন জনে আপনার হাতে
দণ্ড দিতে পারে নারী, পারে না সহিতে
পরের বিচার।"

৭। "চিরদিন কেটে গেছে অর্দ্ধাশনে যার
আজো তার অনশন হল না অভ্যাস!"

৮। "অরাজক কে বলিবে? সহস্ররাজক।"

৯। "গৃহপতি নিদ্রাগত, তা' বলিয়া গৃহে
চোরের কি দৃষ্টি নাই?"

১০। "প্রবল শাসনে তাঁর সিংহগড় দেশে
যত উপসর্গ ছিল অন্ন বস্ত্র আদি
সব গেছে—আছে শুধু অস্থি আর চর্ম্ম।"

১১। "আদরে বুলান হাত ধরণীর পিঠে,
যাহা কিছু হস্তে ঠেকে যত্নে লন তুলি।"

সুমিত্রার শেষ উক্তি স্বামীর রাজকর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহেলায় লজ্জিতা—আপনার ত্যাগের দ্বারা স্বামীকে কর্ত্তব্য-পরায়ণ করিতে কৃতসঙ্কল্পা পত্নীর উপযুক্ত হইলেও তাহা তাঁহার স্বভাবের সহিত সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিসম্পন্ন বলা যায় কি না সন্দেহ—

"ফিরেছ সন্ধানে যার নিশিদিন ধরে
কাননে, কান্তারে, শৈলে, দয়া, ধর্ম্ম, রাজ্য,
রাজলক্ষী সব ভুলে ; যার লাগি দশ
দিকে হাহাকার করেছ প্রচার ; যারে
মূল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে, এই
লহ, মহারাজ, ধরণীর রাজবংশে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শির ; আতিথ্যের উপহার
আপনি ভেটিলা যুবরাজ। পূর্ণ তব
মনস্কাম ; এবে শান্তি হোক, শান্তি হোক
এ জগতে ; নিবে যাক নরকাগ্নি-রাশি।"

শেষ অঙ্কে ছিন্ন শির, পতন ও মৃত্যু, মূর্চ্ছা—এই সকলের মধ্যে যবনিকাপাত—বেদনার উপর বেদনা পুঞ্জীভূত করিবার পক্ষে সহায় হইলেও আন্তরিকতার অভাব প্রকাশ করে।

বিক্রমের হৃদয় সঙ্কীর্ণ—তাহাতে পত্নীর প্রতি প্রবল প্রেম ব্যতীত আর কিছুরই—রাজার কর্ত্তব্য-জ্ঞানেরও—স্থান ছিল না। সেই জন্য সে রাণীর কথার উত্তরে বলিয়াছিল :—

"নহি আমি রাজা। শূন্য সিংহাসন কাঁদে,
জীর্ণ রাজকর্ম্মরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে।"

কিন্তু সেক্সপীয়রের নাটকে বীর এণ্টনীর উক্তি কত দৃঢ়তার পরিচায়ক—

"Let Rome in Tyber melt! and the wide arch
Of the rang'd empire fall! Here is my space."

রেবতীর চরিত্র লেডী ম্যাকবেথের চরিত্র স্মরণ করাইয়া দেয়।

বিক্রম-চরিত্রে প্রতিপাদ্য—"Heaven has no rage like love to hatred turned." কিন্তু সেই পর্য্যন্তই সে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ঐতিহাসিক গ্রীণ ইংরেজ যোদ্ধা মার্লবরো সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"His passion for his wife was the one sentiment which tinged the colourless light in which his understanding moved." কিন্তু সেই ভালবাসা তাঁহাকে অন্যান্য কার্য্যে—এমন কি অর্থসংগ্রহের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত হীন কার্য্যেও অবহেলা করাইতে পারে নাই।

ঘটনার বৈশিষ্ট্য ও বেগ থাকিলেও ভাবের যে ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকের স্বরূপ বিকশিত হয়, তাহার অভাবে 'রাজা ও রাণী' নাটক হিসাবে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই নাটক সম্বন্ধে স্বয়ং যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পরে তাহার সম্বন্ধে এ কথা বলিতে সঙ্কোচ থাকিতে পারে না যে, 'রাজা ও রাণী' নাটক রবীন্দ্রনাথের প্রথম, শ্রেষ্ঠ ও যথার্থ নাটক হইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর নাটকসমূহের মধ্যে তাহার স্থান উচ্চে নহে।

রবীন্দ্রনাথের আর একখানি বড় নাটক—'বিসর্জ্জন'। ১২৯২ বঙ্গাব্দে 'বালক' পত্রে 'রাজর্ষি' উপন্যাস প্রকাশিত হয় এবং পর-বৎসর তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়। 'রাজর্ষি' গল্পের আখ্যান-

বস্তু লইয়া ‘বিসর্জ্জন’ নাটক রচিত। ‘রাজা ও রাণী’ নাটকের যে দৌর্ব্বল্য রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ‘বিসর্জ্জনে’ তাহা সংশোধনের চেষ্টা সপ্রকাশ; কিন্তু যে ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া নাটকখানি রচিত, তাহা নাটকীয় উপকরণের প্রাচুর্য্য প্রদান করিবার মত নহে। তথাপি বাহুল্যবর্জ্জিত হওয়ায় ‘বিসর্জ্জন’ যে নাটকীয় বৈশিষ্ট্য বহুপরিমাণে লাভ করিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

নক্ষত্র রায়ের “স্বগত” উক্তি—

“যেথা যাই, সকলেই বলে ‘রাজা হ’বে?’
‘রাজা হ’বে?” এ বড় আশ্চর্য্য কাণ্ড। একা
বসে থাকি তবু শুনি কে যেন বলিছে—
‘রাজা হ’বে? রাজা হ’বে?’—”

সেক্সপীয়রের ‘ম্যাকবেথে’র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

‘বিসর্জ্জনে’ও সুভাষিতের অভাব নাই। যথা:—

১। “ক্ষীণ দীপালোকে গৃহকোণে থেকে যায়
অন্ধকার; সব পারে, আপনার ছায়া
কিছুতে ঘুচাতে নারে দীপ। মানবের
বুদ্ধি দীপসম, যত আলো করে দান
তত রেখে দেয় সংশয়ের ছায়া”

—ইত্যাদি।

২। “শুনেছি নারীর রোষ পুরুষের কাছে
শুধু শোভা আভাময়, তাপ নাহি তাহে
হীরকের দীপ্তিসম।”

ধ্রুবের প্রতি গুণবতীর রোষ অকারণ ও অসঙ্গত। গুণবতীর চরিত্রে মানবীয়তার অভাব। সে স্বামীর মনোভাব বুঝিতে অক্ষম; কিন্তু সে যখন ধ্রুবকে বধ করিবার জন্য নক্ষত্র রায়কে উপদেশ দিল, তখন তাহার পিশাচী প্রবৃত্তির জয় হইল:—

"অর্দ্ধ রাত্রে আজি
গোপনে লইয়া তারে দেবীর চরণে
মোর নামে করো নিবেদন। তার রক্তে
নিবে যাবে দেব-রোষানল, স্থায়ী হবে
সিংহাসন এই রাজবংশে—পিতৃলোক
গাহিবেন কল্যাণ তোমার।"

জয়সিংহের আত্মদান বিচার-বিবেচনার অপেক্ষা রাখে নাই—সেই স্থানেই তাহার দৌর্ব্বল্য।

শেষ দৃশ্যে গুণবতীর মনোভাবের পরিবর্ত্তন—অতর্কিত, অপ্রত্যাশিত ও অসঙ্গত।

দেবী-পূজায় বলির ব্যাপার লইয়া নাটকীয় ঘটনার আরম্ভ এবং গোমতীর জলে প্রতিমা-নিক্ষেপে নাটকের শেষ। আখ্যানবস্তু-সৃষ্টির উদ্দেশ্য কিছু ছিল কি না, তাহা বিচারের প্রয়োজন নাই। ভক্তি যেমন অন্ধ হয়, সংশয় তেমনই উগ্র ও নিষ্ঠুর হইতে পারে।

'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্য। ইহাতে নাটকের পূর্ণতা নাই—কাব্যের সৌন্দর্য্য অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনাসকলের মধ্যে 'চিত্রাঙ্গদা' অন্যতম। ইহা কাব্য—কেবল কাব্যের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ইহা নাটকাকারে রচিত—নাটকের সজ্জা প্রয়োজনে ব্যবহৃত। চিত্রাঙ্গদা মণিপুর-রাজকন্যা—তাহার ব্যবহার পুরুষের মত। সে বীরত্বের পূজা করিত এবং অর্জ্জুনের বীরত্ব-খ্যাতি শুনিয়াছিল। সে জানিত না, সেই খ্যাতি রবিকরের মত তাহার ঔদাসীন্যের তুষারস্তূপ বিগলিত করিতেছিল। ঘটনাক্রমে অর্জ্জুনকে সে দেখিল ;—

"সেই মুহূর্ত্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্ত্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।"

সে অর্জ্জুনকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইল। কিন্তু অর্জ্জুন তাহার প্রেম-নিবেদন প্রত্যাখ্যান করিলেন—তিনি "ব্রহ্মচারি-ব্রতধারী"—"পতিযোগ্য" নহেন। সেক্সপীয়র যাহাকে "the pangs of despised love" বলিয়াছেন, তাহাতে কিন্তু চিত্রাঙ্গদা নিরাশ হইল না—"বসুধালিঙ্গন-ধূসরস্তনী বিললাপ বিকীর্ণ-মূর্দ্ধজা" হইল না। তাহার কারণ, সে সাধারণ নারীর কোমলতাসর্ব্বস্ব নহে। সে জানিত :—

> "যে নারী নির্ব্বাক ধৈর্য্যে চির মর্ম্মব্যথা
> নিশীথ নয়নজলে করয়ে পালন,
> দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে,
> আজন্মবিধবা আমি সে রমণী নহি।"

মণিপুর রাজবংশে কন্যা জন্মিবে না, ইহাই দেবতার বর ছিল। কিন্তু তবুও "অমোঘ দেবতাবাক্য মাতৃগর্ভে পশি" চিত্রাঙ্গদার দুর্ব্বল প্রারম্ভ পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাকে পুরুষে পরিণত করিতে পারে নাই—সে এমনই কঠিন নারী। সে অর্জ্জুনকে লাভ করিয়া আপনার উদ্বেল প্রেম পূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সে নারীর সৌন্দর্য্যে সুন্দরী ছিল না। পার্ব্বতী যখন মহাদেবকে সেবায় তুষ্ট করিয়া তাঁহার হৃদয়ে স্থানলাভের জন্য সাধনা করিতেছিলেন, তখন হরনেত্র-জন্মা বহ্নিতে মদন ভস্ম হইবার পরে আপনার রূপকে ধিক্কার দিয়াছিলেন; কারণ,—"প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা।" চিত্রাঙ্গদা রূপের জন্য তপস্যা করিল—সে অর্জ্জুনকে মুগ্ধ করিবে। দেবতার কৃপায় সে অসামান্য রূপলাবণ্য লাভ করিল। তখন সে আবার অর্জ্জুনকে দেখা দিল। অর্জ্জুনের মনে হইল :—

> "She was a phantom of delight,
> When first she gleamed before my sight."

অর্জ্জুন মুগ্ধ হইলেন; কারণ :—

> "A thing of beauty is a joy for ever;
> Its loveliness increases; it will never
> Pass into nothingness."

উভয়ের মিলন হইল। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা তৃপ্তির মধ্যে দারুণ অতৃপ্তির জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল—যেন সে বক্ষে বৃশ্চিক রাখিয়া তাহার দংশন-বিষে জ্বলিতেছিল। সে রূপের ছদ্মবেশে ছলনায় অর্জ্জুনকে লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা তাহার ভালবাসার অপমান; ভালবাসার অপমান সে সহ্য করিতে পারে না; যাহা তাহার প্রাপ্য নহে, সে যেন তাহাই লইতেছিল—তাহাতে তৃপ্তি থাকিতে পারে না—মর্ম্মান্তিক বেদনার উদ্ভব অনিবার্য্য হয়। সে নূতন সাধনায় আত্মনিয়োগ করিল। এ বার তাহার সাধনা সফল হইল—তাহার রূপের ছদ্মবেশ মলিন হইবার পূর্ব্বেই সে তাহার ভালবাসায় অর্জ্জুনকে লাভ করিল। সেই লাভই প্রকৃত লাভ। যে ভালবাসা শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। মোহ কখন স্থায়ী সুখের কারণ হয় না। তখন চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনের নিকট আত্মপরিচয় দিল :—

> "আমি চিত্রাঙ্গদা,
> দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
> পূজা করি' রাখিবে মাথায়, সেও আমি
> নহি, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
> পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
> মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
> যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
> কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
> যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
> আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

'চিত্রাঙ্গদা'র বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। কেহ কেহ রুচির দিক হইতে বিবেচনা করিয়া তাহাতে কাব্যে অস্পৃশ্যতার কলঙ্কলেপ দিয়াছেন। অর্জ্জুনের নিকট চিত্রাঙ্গদার প্রেম-নিবেদন ও আত্ম-সমর্পণ তাঁহাদিগের নিকট বিসদৃশ মনে হইয়াছে। তাঁহারা কিন্তু চিত্রাঙ্গদার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করিয়াছেন। মানুষের চিরন্তন ভাব যে সকল অভাব দূর করিয়া, সংস্কারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে লজ্জা তুচ্ছ করিতে প্রণোদিত করিতে পারে, তাহা ভুলিলে 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রকৃত সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে না।

"প্রেম কি যাচলে মিলে সাধলে মিলে ?
সে আপনি এসে উদয় হয় শুভযোগ পেলে।"

মানুষের মন টেনিশনের কল্পিত নিদ্রিত-প্রাসাদের কক্ষে সুপ্ত সুন্দরীর মত অবস্থিতি করে। কিন্তু যখন "শুভযোগ" আগত হয়, তখন দেখা যায়—"A touch a kiss! the charm was snapt" আর তখনই সহসা :—

"A fuller light illumined all,
A breeze thro' all the garden swept,
A sudden hubbub shook the hall,
And sixty feet the fountain leapt."

মাধুর্য্যের প্রতীক রাসেশ্বরী রাধার দিব্য প্রেমের অনুভূতি—

"সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম—
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল বড় প্রাণ।"

আবার—

"যায় যায় যায় বিজয়কুঞ্জে
কুঞ্জরবরগামিনী ;

প্রেম-তরঙ্গে ভরল অঙ্গ
সঙ্গে বরজ-কামিনী।
গগনমণ্ডল অতি নিরমল
শরদ সুখদ যামিনী।"

এই যে অভিসার—মাধুর্য্য-রসের এই যে অভিব্যক্তি, ইহাতে কুণ্ঠার কোন কারণ নাই, সেই জন্য অভিসারকালে—"গগনমণ্ডল অতি নিরমল"—"শরদ সুখদ যামিনী।"

অর্জ্জুনের আহ্বানে তখন চিত্রাঙ্গদার জন্ম জন্ম শতজন্ম তাহার মনোমধ্যে যেমন, দেহমধ্যেও তেমনই জাগিয়া উঠিল ; কারণ :—

"যে যাহারে ভালবাসে সে ত বুকে যায় আসে
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তা'র—"

তাই তখন চিত্রাঙ্গদার—"লজ্জা শ্লথ বসনের মত—খসিয়া পড়িল পদতলে।"

ইংলণ্ডের শুচিতাপ্রিয় কবি টেনিশন তাঁহার 'Princess' কাব্যে লিখিয়াছেন :—

"She turn'd ; she paused ;
She stoop'd ; and out of langour leapt a cry;
Leapt fiery Passion from the brinks of death ;
And I believed that in the living world
My spirit closed with Ida's at the lips ;
Till back I fell, and from mine arms she rose
Glowing all over noble shame : and all
Her false self slept from her like a robe,
And left her woman—"

মরিশের 'The Epic of Hades' কাব্যেও আমরা হেলেনের উক্তি পাই :—

"Time fulfilled my being
With passion like a cup, and with one Kiss
Left me a woman."

অবশ্য কার্লাইল শালীনতার প্রয়োজনে বলিয়াছেন—"Thou shalt not prate even to thyself these open secrets known to all." কিন্তু মানুষের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব নহে এবং স্বভাবই তাহাকে সেই প্রকৃতি দিয়াছে। পুরাণ, কাব্য, বাইবেল প্রভৃতি মানবজাতির সম্পদ্—তাহার সংস্কৃতির উৎস। সে সকলের পরিবর্ত্তন করা বুদ্ধিমানের কায নহে—বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক।

'রাজর্ষি' উপন্যাসের আখ্যানবস্তু লইয়া রবীন্দ্রনাথ যেমন 'বিসর্জ্জন' নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তেমনই 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের আখ্যানবস্তু লইয়া তিনি 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) রচনা করিয়াছিলেন। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' অপরিপক্ব রচনা। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহার দুইখানি উপন্যাসের আখ্যানবস্তু লইয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন, সে তাঁহার প্রতিভার দৈন্যহেতু নহে—কারণ, তাঁহার ভাণ্ডার পূর্ণই ছিল। হয়ত ঐ আখ্যানবস্তুদ্বয় তাঁহার মনে আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছিল, নহেত উপন্যাস দুইখানি তাঁহার মনঃপূত হয় নাই বলিয়া তিনি সেই দুইখানিকে নূতন রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'প্রায়শ্চিত্ত'ই আবার পরে 'পরিত্রাণ' হয়।

'প্রায়শ্চিত্তে'ও কিন্তু 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র সকল দৌর্ব্বল্য দূর হয় নাই। কেবল, উপন্যাসে যেমন নাটকেও তেমনই, কয়টি চরিত্র মনোজ্ঞ।—সে কয়টিই প্রশংসা অপেক্ষা করুণা অধিক আকর্ষণ করে। প্রতাপাদিত্য—মোগলের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া নিজ শক্তিতে স্বাধীন রাজ্য-প্রতিষ্ঠার যে আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়কর। তাঁহাকে স্বাধীন রাজ্য-প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইয়াছিল এবং কঠোর ভাবেই শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতেও হইয়াছিল। সে সময়ে লোক কঠোরতাকে ভয় করিত এবং অনেক লোক "শক্তের ভক্ত ও নরমের যম।" সেই জন্য তিনি

দয়ার, স্নেহের, প্রীতির, ভক্তির অনুশীলন করা দৌর্ব্বল্যজ্ঞানে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি পুত্রকেও ক্ষমা করিতে চাহেন নাই; আর পিতৃব্য—স্নেহশীল পিতৃব্যকে হত্যা তাঁহার কলঙ্ক ঘোষণা করে। তিনি যেন স্নিগ্ধ-শ্যাম-শোভাসম্পন্ন-বৃক্ষলতাশূন্য কঠিন প্রস্তরের স্তূপ—পর্ব্বত। কিন্তু তাঁহারই কঠিন বক্ষ হইতে দুইটি স্নিগ্ধ সলিল-ধারা নির্গত হইয়া সংসার শোভাময় করিয়াছিল—পুত্র উদয়াদিত্য ও কন্যা। আর তাঁহার মস্তকের উপর উদয়াস্ত ভাস্কর-কর-মনোহর-শুভ্র তুষারমণ্ডিতশৃঙ্গ—পিতৃব্য বসন্ত রায়—

"As some tall cliff that lifts its awful form,
Swells from the vale, and midway leaves the storm,
Though round its breast the rolling clouds are spread,
Eternal sunshine settles on its head."

চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়ের ভাঁড় রমাই, মন্ত্রী, ও রামচন্দ্র স্বয়ং যেরূপ ভাঁড়ামী করিয়াছেন, তাহাতে যে হাস্যোদ্রেক হয় তাহা কাতুকুতু দিয়া লোককে যে হাসি হাসান যায় তাহা ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। অথচ উপভোগ্য হাস্যরসের অভাব রবীন্দ্রনাথের ছিল না।

যদি রামচন্দ্রের অপদার্থতা দেখাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঐরূপ "মোটা রসিকতা"র অবতারণা করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সে উদ্দেশ্যও যে সফল হইয়াছে, এমন বলা যায় না। সেকালে সমাজে যে রসবোধের অভাব ছিল না, তাহা মনে করা অসঙ্গত নহে। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে লোকের রুচি কিরূপ ছিল, তাহা ভারতচন্দ্রের রচনায় তাঁহার বংশপতি পূর্ব্বপুরুষের পত্নীদ্বয়ের ব্যবহার-বর্ণনা যে তিনি সভায় পাত্রমিত্রবেষ্টিত হইয়া শুনিতেন ও উপভোগ করিতেন, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু জনশ্রুতি তাঁহার গোপাল ভাঁড়ের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচায়ক যে সকল উক্তি রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সেগুলিতে সূক্ষ্ম হাস্য-

রসিকতার পরিচয় সপ্রকাশ। তখন পরিবারে উক্তি-প্রত্যুক্তিতেও তাহা প্রকাশ পাইত। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র জলপথে ভ্রমণকালে একটি সুন্দরী তরুণীকে দেখিয়া—তাঁহার পরিচয় লইয়া— যখন তাঁহাকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন কন্যার পিতা, সেরূপ বিবাহে তাঁহার কৌলীন্য-সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হইবে মনে করিয়া, প্রথমে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। শেষে তিনি কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে প্রস্তাবে সম্মতি দেন। কৃষ্ণচন্দ্র রৌপ্যনির্ম্মিত পালঙ্কে শয়ন করিতেন। বিবাহের পরে একদিন তিনি যখন তাঁহার পত্নীকে বলেন যে, পত্নীর পিতা তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়াই কন্যা রৌপ্য-পালঙ্কে শয়ন করিতে পারিলেন, তখন—পিতার আর্থিক অবস্থার জন্যই স্বামী ঐরূপ কথা বলিতেছেন বুঝিয়া—মহারাণী উত্তর দিয়াছিলেন, পিতা যদি—বংশ-মর্য্যাদা বর্জ্জন করিয়া—আর একটু উত্তরে সরিয়া যাইতে সম্মত হইতেন, তবে তাঁহার কন্যা স্বর্ণ-পর্য্যঙ্কে শয়ন করিতে পাইতেন—অর্থাৎ পিতা যদি মুসলমান নবাবকে কন্যাদানে সম্মত হইতেন, তবে কন্যা আরও ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিতে পাইতেন।

কালী-কীর্ত্তনে রামপ্রসাদ লিখিয়াছিলেন—

"গিরিশ-গৃহিণী গৌরী গোপবধূবেশ।
কসিতকাঞ্চনকান্তি প্রথম বয়েস॥
সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে শুনে মায়ের বেণু॥

তাহাতে আজু গোঁসাই বলেন—

"না জানে পরম তত্ত্ব
কাঁঠালের আমসত্ত্ব
নারী হয়ে ধেনু কি চরায় রে?
তা' যদি হইত যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায় রে?"

রসরাজ ভাদুড়ী মহাশয়ের পদপূরণ ও হাস্তরসের নিদর্শন—

"অন্দর ভাঙ্গিলে হয়, সকলই সদর ;—
টাকাকড়ি না থাকিলে থাকে না কদর ;
শাল জোড়া ছিঁড়ে গেলে চাদরে আদর ;
পথারে পড়িলে তরি 'বদর' ! 'বদর' !"

রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে তাঁহার রাজগর্ব্ব ফুটিয়াছে।

যখন রবীন্দ্রনাথ 'বৌঠাকুরাণীর হাট' রচনা করেন, তখন রামরাম বসুর রচিত—'রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র—যিনি বাস করিলেন যশহরের ধূমঘাটে। একব্বর বাদসাহের আমলে' প্রতাপাদিত্যসম্বন্ধীয় পুস্তক প্রচলিত ছিল। উহা ১৮০১ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে ছাপা হয়।

রবীন্দ্রনাথের স্নিগ্ধ সরস হাস্তরসভাণ্ড যে অপূর্ণ ছিল না— 'চিরকুমার সভা' কৌতুক নাট্যে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এই নাটক-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লিখিয়াছিলেন— ইহার "চন্দ্রমাধব বাবুর চরিত্রে অনেক মিশান আছে, তার মধ্যে কতক মেজদাদা (অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর), কতক রাজনারায়ণ বাবু এবং কতক আমার কল্পনা আছে। নির্ম্মলা তথৈবচ—এর মধ্যে সরলার অংশ অনেকটা আছে বটে।"

'চিরকুমার সভা' কিরূপে তাহার নাম-পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহা নূতন সভ্য নৃপবালার ও নীরবালার পরিচয় অক্ষয় বাবু যাহা দিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝা যাইবে :—

"আমার সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। এঁরা আমার ছুটি শ্যালী। শ্রীশবাবু ও বিপিনবাবুর সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ শুভলগ্নে আরও ঘনিষ্ঠতর হবে। এঁদের প্রতি দৃষ্টি করলেই বুঝবেন, রসিক-বাবু এই যুবক ছুটির যে মতের পরিবর্ত্তন করিয়েছেন, সে কেবলমাত্র বাগ্মিতার দ্বারা নয়।"

এইরূপে কুমার-ব্রতের অবসান হইল—

"Behold our sanctuary
Is violate, our laws broken."

দৈর্ঘ্যহেতু 'চিরকুমার সভা'র রস ঘন হইতে পারে নাই। সেই জন্যই তাহার ত্রুটি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। Brevity is the soul of wit—আর অতি-বিস্তৃতি কৌতুক-রসের মিষ্টত্ব হ্রাস করে।

রবীন্দ্রনাথের 'বিদায়-অভিশাপ' যেমন নাটক বলা যায় না—তাঁহার 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' তেমনই কবিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

'চিত্রাঙ্গদা'কে নৃত্য-নাট্যে পরিণত করিবার সময়ে তিনি মূল নাটকের মর্ম্মকথা ভূমিকায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন :—

"প্রভাতের আদিম আভাস রক্তবর্ণ আভার আবরণে।
অর্ধসুপ্ত চক্ষুর 'পরে লাগে তারই প্রেরণা।
অবশেষে রক্তিম আবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরঞ্জন শলাকায়
সমুজ্জ্বল হয় জাগ্রত জগত।
তেমনি সত্যের প্রথম উপক্রম সাজসজ্জার বহিরঙ্গে,
বর্ণবৈচিত্র্যে,
তারই আকর্ষণ অসংস্কৃত চিত্রকে করে অভিভূত।
একদা উন্মুক্ত হয় সেই বহিরাচ্ছাদন,
তখনই প্রবুদ্ধ মনের কাছে তার পূর্ণ বিকাশ।
এই তত্ত্বটি চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্ম্মকথা।
এই নাট্যকাহিনীতে আছে—
প্রথম প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,
পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে
সহজ সত্যের নিরলঙ্কৃত মহিমায়।"

'বিদায় অভিশাপে'র মর্ম্মকথা—দেবতনয়ের ভালবাসার ঔদার্য্য

ও মহত্ত্ব আর দৈত্যদুহিতার ভালবাসার সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা—তুলনায় সমালোচনা। দেবগণের আদেশে বৃহস্পতিপুত্র কচ সঞ্জীবনী-বিদ্যা-শিক্ষার্থ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকটে যাইয়া সহস্র বৎসর যাপন করেন। সেই সময়ের মধ্যে দৈত্যগুরুর দুহিতা দেবযানীর সহিত কচের প্রণয় জন্মে। সে প্রণয় পরস্পরের। সিদ্ধকাম কচ যখন স্বর্গে ফিরিবার জন্য দেবযানীর নিকট বিদায় চাহিতেছেন :—

"আশীর্ব্বাদ করো মোরে
যে বিদ্যা শিখিনু তাহা চিরদিন ধ'রে
অন্তরে জাজ্বল্য থাকে উজ্জ্বল রতন,
সুমেরুশিখর-শিরে সূর্য্যের মতন
অক্ষয় কিরণ।"

তখন পরস্পরের কথায় পরস্পরের মনের গোপন কথা আর গোপন থাকিল না—ব্যক্ত হইয়া পড়িল—উভয়ে উভয়ের ভালবাসায় আকৃষ্ট। তখন দেবযানী কচকে বলিল :—

"রমণীর মন
সহস্র বর্ষেরই, সখা, সাধনার ধন।"

কচ সে কথা স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—বিদ্যা শিক্ষা করিয়া দেবগণের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইবেন ; কারণ, তিনি দেবগণের উপকারের জন্যই বিদ্যা শিখিতে আসিয়াছিলেন। আপনার ভালবাসা তাঁহার নিকট—দেবহিত-সাধনের জন্য—তুচ্ছ। কেন না, সে ভালবাসা ব্যক্তির। তাই তিনি বলিলেন—

"দেবসন্নিধানে শুভে করেছিনু পণ
মহাসঞ্জীবনী বিদ্যা করি উপার্জ্জন
দেবলোকে ফিরে যাব ; এসেছিনু তাই,
সেই পণ মনে মোর জেগেছে সদাই।

পূর্ণ সেই প্রতিজ্ঞা আমার, চরিতার্থ
এত কাল পরে এ জীবন ; কোনো স্বার্থ
করি না কামনা আজি।”

ইহা দেবতার উপযুক্ত কথা—তাহার গৌরব ত্যাগে—ভোগে নহে, পরার্থপরতায়—স্বার্থসন্ধানে নহে।

কিন্তু দৈত্যদুহিতার পক্ষে সে ভাব অনধিগম্য। তাই দেবযানী কচের উক্তির মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না—সে তাহার স্বার্থে আঘাতে প্রেমাস্পদের কল্যাণের জন্য আপনি ত্যাগ স্বীকার করিতে অক্ষম হইয়া কচকে অভিশাপ দিল :—

“তোমা ’পরে
এই মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ,—তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ,
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

সে কচের কার্য্য তাহাকে অবহেলা বলিয়া মনে করিল—যে ভাব সেই কার্য্যের প্রণোদক তাহা দেবযানীর নিকটে অনাদৃত—তাহার পক্ষে সে ভাব লাভ করিবার চেষ্টা প্রাংশুলভ্য ফলের জন্য উদ্বাহু বামনের চেষ্টা মাত্র। কচ কিন্তু দেবযানীর অভিশাপে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া—আপনার ভালবাসার পরিচয় দিয়াই বলিলেন :—

“আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হ’বে ;
ভুলে যাবে সর্ব্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।”

‘গান্ধারীর আবেদন’ আর এক প্রকার ভাববৈষম্যসম্ভূত। নারীর নিকট ধর্ম্ম স্নেহ, প্রেম—এমন কি মাতৃস্নেহ অপেক্ষাও আদরের—ধর্ম্মের সহিত বিরোধে ত্যাজ্য। নারীর সরল বুদ্ধি ও ধর্ম্মনিষ্ঠা পুরুষের কুটিল বুদ্ধি ও স্বার্থপরতা অপেক্ষা কত উচ্চে

অবস্থিত—কত পবিত্র তাহা এই রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে এবং অনবদ্য সৌন্দর্য্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ আরও কতকগুলি ছোট ও বড় নাটক—নাট্য রচনা করিয়াছেন। সে সকলের মধ্যে 'অচলায়তন' প্রকাশের পরেই বিশেষ আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আদরের আন্দোলন-কালে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিতর্ক ও তাঁহার 'হিং টিং ছট' কবিতা লইয়া আন্দোলন স্মরণ করিয়া একাধিক সুধী ইহা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ বিবেচনা করিয়াছিলেন। প্রথমে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রে (কার্ত্তিক, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধে বলেন :—

"মানুষ চিরকালই দুর্ব্বল, তাহার মনের বল পরিমিত, সে চিরকালই নিয়মের মোহে অভিভূত। একটা বিরাট মনুষ্য-সমাজ যে মোহ কাটাইয়া 'শুধু আলো, শুধু প্রীতি' লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে, শুধু দাদাঠাকুরকে লইয়া হুটোপুটি খেলিবে, তাহার লক্ষণ খুব সুস্পষ্ট দেখিতেছি না। যে দিন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনার বলে দাদাঠাকুরের সঙ্গে আচার্য্যদেবকে মিলিয়ে দিতে পারবেন, সে দিন আমাদের অচলায়তনের সব দুঃখ ঘুচবে। সে দিন ঘনাইয়া আসিতেছে কি না, জানি না; কিন্তু সেই শুভ অবসর আসিবার পূর্ব্বে সাবধান, যেন আগাছার সঙ্গে সঙ্গে ফসল শুদ্ধ নষ্ট হইয়া না যায়।"

ললিতবাবুর প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি—"রবির দীপ্তির কাছে, এই ক্ষুদ্র কাচখণ্ড অকিঞ্চিৎকর।" তিনি বলেন :—

(১) রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তনে'—হিন্দুর "আচারমার্গের উপর বিষদিগ্ধ বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন।"

(২) "আর্ট হিসাবে নাটকখানির একটি দোষ দেখা যায়। রচনাটি অত্যন্ত diffuse, হিং টিং ছটের সে compactness ইহাতে নাই, হেঁয়ালি নাট্যের সে খোলা প্রাণের (wit) রসিকতা যেন ঈষৎ অমন্দ প্রাপ্ত হইয়াছে।"

অগ্রহায়ণ মাসের 'আর্য্যাবর্ত্তে' অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন :—

"('অচলায়তনে') আছে কেবল একরূপ বিকৃত হিন্দুয়ানীর উপর * * নৃত্য ও লাঞ্ছনা। গানগুলি ছাড়া সমস্ত পুস্তকখানি রবিবাবুর একেবারে অনুপযুক্ত।"

ললিতবাবুর পূর্ব্বোক্ত উক্তিদ্বয় লইয়া অক্ষয়চন্দ্র লিখেন :—

"যদি মিষ্টত্বে ঈষৎ অম্লত্ব থাকে, তাহা হইলে তাহা নিছনি লইয়া—বরণ করিয়া ঘরে তুলিতাম। তা' কোথায়? সেই ঈশ্বর গুপ্তের কথা—

'এখনকার নাটক,
না-মিষ্ট, না-টক।'

তাই কি ঝাল আছে গা? 'বিষদিগ্ধ বিদ্রূপবাণ' কি এইরূপ? কথায় বলে :—

'হাসতে হাসতে মারবে ঠোনা,
লাগবে যেন বিদ্যুৎ ঝনঝনা।'

তাহা কি 'অচলায়তনে' কোথাও আছে। তাহা নাই—থাকিলে হৃদয়ে না রাখিতে পারি, মাথায় লইতাম।"

বোলপুর হইতে রবীন্দ্রনাথ ৩রা অগ্রহায়ণ (১৩১৮ বঙ্গাব্দ) ললিতবাবুর সমালোচনার উত্তরে এক পত্র লিখেন। উহা 'আর্য্যাবর্ত্তে'ই প্রকাশিত হয়। তিনি লিখেন :—

"ধর্ম্মকে প্রকাশ করিবার জন্য, গতি দিবার জন্যই আচারের সৃষ্টি—কিন্তু কালে কালে ধর্ম্ম যখন সেই সমস্ত আচারকে, নিয়ম-সংযমকে অতিক্রম করিয়া বড় হইয়া উঠে, অথবা ধর্ম্ম যখন সচল নদীর মত আপনার ধারাকে অন্য পথে লইয়া যায়, তখন পূর্ব্বতন নিয়মগুলি অচল হইয়া শুষ্ক নদীপথের মত পড়িয়া থাকে।—বস্তুতঃ তখন তাহা শুষ্ক মরুভূমি, তৃষ্ণাহারা তাপনাশিনী স্রোতস্বিনীর ঠিক বিপরীত। সেই শুষ্ক পথটাকেই সনাতন বলিয়া সম্মান করিয়া

নদীর ধারার সম্মান যদি একেবারে পরিত্যাগ করা যায়, তবে মানবাত্মাকে পিপাসিত করিয়া রাখা হয়। সেই পিপাসার্ত্ত মানবাত্মার ক্রন্দন কি সাহিত্যে প্রকাশ করা হইবে না, পাছে পুরাতন নদীপথের প্রতি অনাদর দেখানো হয় ?"

ললিতকুমার ইহার কোন উত্তর দেন নাই বটে, কিন্তু মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ('আর্য্যাবর্ত্ত'—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ)। তাঁহার বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথ যে অচলায়তনের কথা বলিয়াছেন—তাহা "বর্ত্তমান সময়ে নির্জ্জল কাল্পনিক, কোনও দিন যে কোনও দেশে ছিল, বিশেষতঃ এ দেশে যে ছিল, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।"

বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সে সকলের অনেকগুলি রূপক। সে সকলের রচনা যত মার্জ্জিতই কেন হউক না—সেগুলি প্রধানতঃ ভাবের অভিব্যক্তি—সে সকলে মানুষের অভিব্যক্তি নাই। সেই সকলের একখানি—'তাসের দেশ' তিনি এইরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন—

"কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুভাষচন্দ্র,

স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ ক'রে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

এই গুলিতে বাহুল্য নাই—পড়িতে বা অভিনয় দেখিতে শ্রান্তি দেখা দেয় না। এগুলির উক্তি-প্রত্যুক্তিও যেমন সঙ্গত, তেমনই তীক্ষ্ণ। অনেকস্থলে কৌতুক সরস।

এই স্থানে রবীন্দ্রনাথের নাটকে রসিকতা সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের বড় নাটকগুলিতে কৌতুক রস যে সর্ব্বত্র উপভোগ্য নহে—তাহাতে সন্দেহ নাই। ডক্টর সুকুমার সেন

বলিয়াছেন—"রবীন্দ্রনাথের কৌতুকনাট্য প্রহসনগুলির * * * কৌতুক রস স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও অনাবিল। একটু বুদ্ধি-গ্রাহ্য বলিয়া হয়ত সর্ব্বত্র সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য নয়।" যাঁহারা কোন কোন স্থানে রবীন্দ্রনাথের কৌতুক-রস উপভোগ করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের বুদ্ধিতে দোষারোপ করিয়া সে রসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা যেন—"এ যে না বুঝে, তা'র কণ্ঠি ছিঁড়ি" বলার মত। অবশ্য ভক্তের প্রশংসা অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত হয়। মোলেয়ার তাঁহার রচনার রস সর্ব্বজনোপভোগ্য হইল কি না, তাহা বুঝিবার জন্য তাঁহার রচনা তাঁহার রজকিনীকে পড়িয়া শুনাইতেন। রচনার—বিশেষ কৌতুক রচনার বা উক্তির রস সর্ব্বজনোপভোগ্য হইলেই তাহা সার্থক হয়।

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা সাহিত্যের নানা বিভাগ পুষ্ট ও সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা অবশ্যই বলিব :—

"He did with superlative charm and skill a thing which mankind has agreed to include among the noblest and most elevated occupations of the human intellect."

কাজেই তাঁহার নাটকগুলিতে যদি কোথাও কোন ত্রুটি থাকিয়া থাকে, তবে সেজন্য তাঁহার প্রতিভার গৌরব ম্লান হয় না। তিনি বাঙ্গালা নাটকেও নানা রূপ দিয়াছেন—কেবল নাটক নাটিকা ও প্রহসন রচনা করিয়াই কার্য্য শেষ করেন নাই। 'নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'র "বিজ্ঞপ্তি"তে তিনি লিখিয়াছেন :—

"এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। এ কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতঃই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম ক'রে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য্য নয়। যে পাখির প্রধান

বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।”

বলা বাহুল্য, এই উক্তি অবশ্য-স্বীকার্য্য—ইহা কেবল কৈফিয়ৎ বলা সঙ্গত নহে।

কবিতার জন্য যেমন, নাটকের জন্যও তেমনই রবীন্দ্রনাথ নানা সাহিত্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন—সকল উপকরণই তাঁহার কল্পনারত্নাকর-মন্থন-লব্ধ নহে। কিন্তু ক্ষুদ্র বালুকণা যেমন শুক্তির মধ্যে প্রবেশ করিলে শুক্তির রসে লাবণ্যময় মুক্তায় পরিণত হয়, তেমনই সে সকল উপকরণ রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার দ্বারা নূতন ও সম্মোহন রূপ লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটক ও প্রহসন যদি তাঁহার কবিতার পার্শ্বে মলিন-জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ থাকিতে পারে না। ইংরেজ কবি টেনিশন সাতখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সে সকলের রচনায় তিনি অল্প শ্রমও স্বীকার করেন নাই। ডিক্‌সন সেগুলি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

“Tennyson, led by the irony of fate, gave up some of the best years of his life to the composition of dramatic poetry, to which his genius cannot be said to have inclined him, and in which he certainly attained no crown of lavish praise. Fine as are occasional passages and dramatic as are many of the scenes * * * * these plays are essentially poems upon which a dramatic form has been impressed, but impressed unconvincingly. Neither in action nor in representation of character are we persuaded that they are dramatically conceived.”

রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে যদি তাহাই বলা যায়, তবে কি

তাহা অসঙ্গত হইবে ? তাঁহার 'মালিনী' নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

"সেকস্‌পীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।"

সেই "বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাতে"র অভাবই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাহার কারণও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। টেনিশনের নাটকের দৌর্বল্য-প্রসঙ্গে ওয়াগ বলিয়াছেন—

"The dramatic talent has two distinct issues, the one physiological, the other psychological. To write a strong and successful drama the author must possess the power to identify himself with motives and sensations alien to himself; he must hold the faculty of living the life he represents. This faculty is bestowed by the psychological side of the dramatic talent. But there is the other side, which (for the want of a more distinctive title) may be called the physiological: the sense of action, of situation, of movement. Without these two elements a sound drama cannot be produced; the sense of action and situation, standing alone, prompts to melodrama; the sense of analysis standing alone, works out a psychological study intense, but undramatic."

যাঁহার নাটককে রবীন্দ্রনাথ নাটকের আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তিনি যেন রঙ্গমঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া রচনা করিতেন—দর্শকগণ তাঁহার সম্মুখে সমবেত। তিনি রঙ্গমঞ্চে পদবিক্ষেপশব্দ জানিতেন, তিনি যেন শুনিতে পাইতেন, তাঁহার রচনার প্রতি ছত্র উক্ত হইতেছে, তিনি যেন অভিনেতার অঙ্গসঞ্চালন প্রত্যক্ষ করিতেন ;

যে সকল দর্শক উচ্চে বা পার্শ্বে বা ভূমিতে উপবিষ্ট, যেন তাহাদিগকেও লক্ষ্য করিতেন। মর্টন লুস বলেন, সেক্সপীয়র যেন বলিতেন :—

"If I did not write every word of this for the stage what did I write it for? Certainly not to be read; who is going to read it?—when, where, how and why?"

রবীন্দ্রনাথের নাটক সেরূপ নহে—সেরূপ হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার ছোট বড় বহু নাটকে ও প্রহসনে যত সুভাষিত আছে, প্রতিভার যে পরিচয় আছে—তাহাতে সেগুলি যদি সাদরে পঠিত না হয়, তবে তাহা একান্তই দুঃখের বিষয় হইবে। সেগুলি শিক্ষিত সমজদারদিগের জন্য অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে আদৃত হইতে পারে না। সাধারণ রঙ্গালয়ে সে সকলের অভিনয় সাফল্যমণ্ডিতও হয় নাই।

আমরা রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির আলোচনায় অনেক স্থান দিয়াছি। তাহার কারণ, তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে নাটক-লেখকমাত্র হিসাবে দেখিলে ভুল হইবে। তিনি বহুদিন বাঙ্গালার সাহিত্যিক সমাজের একটি বিশিষ্ট অংশের প্রতিনিধি, প্রতীক ও আদর্শরূপে বিরাজিত ছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে যখন তরুণ সমাজে তাঁহার অনুকরণে কবিতা রচনা ও কেশপ্রসাধন প্রচলিত হইয়াছিল, তখন যেমন এক দল তরুণের অনুকরণস্পৃহাহেতু তাহাদিগকে—তাঁহার প্রথম কবিতা-সংগ্রহের নামে নামকরণ করিয়া—"রবিচ্ছায়া" বলা হইত, তেমনই তাঁহার আদর্শে বহু বাঙ্গালা লেখক নাটক রচনা করিয়াছেন—হয়ত ভবিষ্যতেও করিবেন। কিন্তু গঙ্গোদকের পাবনী শক্তি যেমন কূপোদকে থাকে না, তেমনই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অনেকের পক্ষেই দুষ্প্রাপ্য এবং প্রতিভার অভাবে তাঁহাদিগের রচনা ব্যর্থ হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে আবর্জ্জনাবৃদ্ধি করিতে পারে। জনশন বলিয়াছেন—"Almost all absurdity of conduct arises from

the imitation of those whom we cannot resemble." সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই কথার প্রয়োগ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের আলোচনা করিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায় শেষ করিলাম। যাঁহারা জীবিত নাটক-লেখক তাঁহাদিগের রচনার আলোচনা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে—বোধ হয়, শ্রোতৃবৃন্দেরও নহে। জীবিত লেখকদিগের রচনার সমালোচনা—কোন ইংরেজ লেখক—জ্বলদঙ্গারের উপর পদক্ষেপের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

আবার বার্ণার্ডশ যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বিবেচ্য—নাটকীয় শিল্পে জোয়ার-ভাঁটা আছে :—

"From time to time dramatic art gets a germinal impulse. There follows in the theatre a spring which flourishes into a glorious summer. This becomes stale almost before its arrival is generally recognised; and the sequel is not a new golden age, but a barren winter that may last any time from fifteen years to a hundred and fifty. Then comes a new impulse, and the cycle begins again."

যদি বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যে ও রঙ্গালয়ে যাহাকে feverish activity বলে তাহার পরে অবসাদ আসিয়া থাকে—জোয়ারের পরে যদি ভাঁটার টান ধরিয়া থাকে, তবে আমরা আশা ও আকাঙ্ক্ষা করিব, নূতন যুগের সূর্য্যোদয় যেন বিলম্বিত না হয়—পরন্তু বাঙ্গালীর নাটকীয় প্রতিভার পুনঃপ্রদীপ্তি যেন অদূরবর্ত্তী হয়।

এই নাটকীয় প্রতিভাকে কালোপযোগী কার্য্যে প্রযুক্ত করিতে হইবে। সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে—আচার-ব্যবহার আর সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্ববৎ নাই—লোকের রুচির যেমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তেমনই জীবন-সংগ্রামের জটিলতা ও তীব্রতার জন্য মানুষের সময়ের মূল্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। সেই সকল কারণ চলচ্চিত্রের উদ্ভবে ও আদরে দেখিতে পাওয়া যায়। পরিবর্ত্তনের জন্য লোকের আগ্রহ

যেন অকারণ অধিক হইয়া উঠিতেছে। আমরা যে সময়ে বাস করিতেছি, সে সময় লর্ড কার্জ্জনের মতে—"is never happy unless it is deserting its old models and traditions and running about in quest of something foreign and strange."

বাঙ্গালী নাটককার ও রঙ্গালয়-পরিচালকদিগকে এ সব বিবেচনা করিয়া কায করিতে হইবে—

"New occasions teach new duties; Time
makes ancient good uncouth;
They must upward still and onward, who
would keep abreast of Truth."

৬

উপসংহার

বাঙ্গালা নাটক—ইংলণ্ডে রাণী এলিজাবেথের সময়ের ইংরেজী নাটকের সহিত তুলনা করা সঙ্গত নহে। ঐ সময়ে ইংলণ্ডে নাটকের প্রাধান্যের প্রধান কারণ তিনটি :—

(১) তখন সাহিত্যে নাটকই অধিক অর্থার্জ্জনের উপায় ছিল। সাহিত্য-ব্যবসায়ীরা যেমন সেই জন্য নাটক-রচনায় আত্মনিয়োগ করিতেন, তেমনই নাটক-রচনা অনেকের সাধনার বিষয়ও হইয়াছিল।

(২) তখন নাটক যত অধিক লোক আদর করিত, তত আদর সাহিত্যের আর কোন সৃষ্টিকে করিত না। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, তখন জনগণকে আকৃষ্ট করিবার উপায় নাটকের মত আর কিছুই ছিল না। তখনও মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা অধিক হয় নাই; এবং পুস্তকের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। যাঁহারা পড়িতে পারিতেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা অল্প ছিল—তখনও তথায় প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক নহে। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পোর্টসমাউথে চর্ম্মকার জন পাউণ্ডস্ যখন Ragged School প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তাঁহাকে গোল আলু সিদ্ধ লইয়া বালকদিগকে প্রলুব্ধ করিতে তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইত।

(৩) সে কাল নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ ও তাহার অনকূল ছিল। লোকের জীবনে নাটকীয় ঘটনার বাহুল্য ছিল এবং সাহিত্য যে পরিবেশনে সৃষ্ট হয়, তাহার প্রভাবে প্রবাহিত হয়। তখন ইংরাজরা অনেক দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত—the spirit of adventure was abroad.

20—1769 B.

বাঙ্গালায় যখন নাটক-রচনা আরম্ভ হয়, তখন অবস্থা অন্যরূপ। 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটক যখন রচিত হয়, তখন বাঙ্গালা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে পরিবর্ত্তিত অবস্থায় আপনার ব্যবস্থা করিয়া লইতেছে—পাঠান, মোগল, বর্গী বাঙ্গালা শোষণ করিয়া গিয়াছে। তাহার পরের অবস্থা—"মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌প্যাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।" তখনও সিপাহীবিপ্লব—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত, ঘটে নাই। তখন ইংরেজী শিক্ষার আদর হইয়াছে—কিন্তু তখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; সুতরাং যে উপায় অবলম্বনের উদ্দেশ্য—"to diffuse the fertilising waters of intellectual knowledge from the copious fountain-head...by a thousand irrigating channels" তাহা অবলম্বিত হয় নাই। বাঙ্গালার সমাজ তখন পুরাতন ও নূতনের মধ্যে অনিশ্চিত অবস্থায় অবস্থিত। যদিও তীর্থযাত্রাহেতু—জলপথে ও স্থলপথে—বাঙ্গালার সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সম্বন্ধ ছিল এবং তীর্থস্থানে মেলাগুলি মতের আদান-প্রদানের ও পণ্য-বিক্রয়ের উপায় ছিল, তথাপি তখন নাটকীয় ঘটনার অভাব। রঙ্গালয় তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেক্সপীয়ার ও তাঁহার সমসাময়িক নাটককারদিগের মত নাটককারের বাঙ্গালায় আবির্ভাব তখন সম্ভব নহে। ১৮৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দেও ফ্রেডরিক হ্যারিশন লিখিয়াছিলেন—

"If another Dickens were to break out to-morrow with the riotous tomfoolery of Pickwick at the trial, or of Waller and Stiggins, a thousand lucid criticisms would denounce it as vulgar balderdash."

বাঙ্গালা নাটক সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সৃষ্ট, পুষ্ট ও রক্ষিত। তাহার ক্রমোন্নতি সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে। সে পরিবর্ত্তন হ্যামলেটের মত চরিত্র-সৃষ্টির ও সেরূপ

চরিত্র সৃষ্ট হইলে তাহা উপভোগের উপযুক্ত নহে। কারণ, হ্যামলেট-চরিত্র বাঙ্গালী সমাজে সম্ভব নহে।—

"The spirit of Hamlet is indomitable. It may be quenched, but it cannot be conquered. The freedom into which it has entered is the awful freedom that misery alone can give. Beautiful, desolate, harrowed with pain, but even tremulous with the life of perception and feeling, it moves among phantom shapes and ghastly and hideous images, through wrecks of happiness and the glimmering waste cf desolation. It is a distracted and irresolute spirit, made so by innate gloom and by the grandeur of its own vast perceptions. But it is never supine."

এইরূপ চরিত্র-সৃষ্টি যে বাঙ্গালী-সমাজে সম্ভব নহে, তাহার কারণ, তাহা প্রকৃতের সহিত সম্পর্কশূন্য, সাধারণ দর্শকের কল্পনা-সীমারও বহির্ভূত।

আবার যেমন ইংরেজী সাহিত্যে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্দ্ধশতাব্দীর কিঞ্চিৎ অধিক কাল দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, তেমনই বাঙ্গালা সাহিত্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের পরবর্ত্তী কাল অন্য ভাগে বিভক্ত। ইংরেজী সাহিত্যে টেনিশন, ব্রাউনিং, কার্লাইল, রাস্‌কিন, লিটন, থ্যাকারে, ডিকেন্স, ট্রলপ, জর্জ্জ ইলিয়ট, ডিস্‌রেলী, কিংসলি প্রভৃতির উৎকৃষ্ট রচনা-সমূহ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের। কেবল তাহাই নহে—১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড পামারষ্টোনের মৃত্যুতে পার্লামেণ্টে পুরাতনের অবসান এবং সেই বৎসরেই আমেরিকার শাসন-পদ্ধতির পুনর্গঠনকালে আব্রাহাম লিঙ্কনের তিরোভাব। বাঙ্গালায় তেমনই ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোভাব—"সেই বাঙ্গালা লেখকদিগের গুরু, বাঙ্গালা পাঠকদিগের সুহৃদ্ এবং সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল

প্রতিভাশালী সন্তান” সেই বৎসর “আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক”—অকালে অস্তমিত হইয়াছিলেন। মধুসূদন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী—তাঁহার মৃত্যুতে ‘বঙ্গদর্শন’ লিখিয়াছিলেন—

“ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন * * * সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও * * *”

দীনবন্ধুও পূর্ব্ববর্ত্তী। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের স্রোতঃ নূতন পথে প্রবাহিত হয়—আপনাকে সার্থক করিবার জন্য স্বাধীনতার সাগর-সন্ধানে অগ্রসর হয়—তখনও তাহার বেগ মন্থর ও কল্লোল ক্ষীণ; কিন্তু তাহার গতি আরম্ভ হইয়াছে—বাঙ্গালী সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতিতে নূতন মন্ত্রে দীক্ষাদাতা—রাজনীতিক কার্য্যে প্রধান কর্ম্মী এবং বাঙ্গালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে নির্ব্বাচিত সভাপতি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাঙ্গালীকে বাঙ্গালায় শিক্ষাদানের জন্য দ্বার মুক্ত করিয়া অমিত উদ্যমে—য়ুরোপীয়দিগের বিকৃত মত খণ্ডন করিয়া হিন্দু সভ্যতার ও সংস্কৃতির দৃশ্যমান শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজ নানা সংস্কারে অগ্রণী হইয়াছিলেন।

সেই সময়ে, সামাজিক অবস্থায়, বাঙ্গালায় যে সকল নাটক রচিত হয় ও বাঙ্গালার রঙ্গালয় সে সকলের অভিনয় করিয়া তাহাদিগের প্রচার করে—তাহাই আমাদিগের বিবেচ্য। তখন নাটকই লোককে আকৃষ্ট করিবার প্রধান উপায় নহে, বাঙ্গালী পাঠকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে এবং রঙ্গালয় এক সম্প্রদায়ের সন্দেহভাজন।

সেই অবস্থায়—নানা বিঘ্নকঙ্করকণ্টকিত পথে অগ্রসর হইয়া

বাঙ্গালা নাটক ও বাঙ্গালার রঙ্গালয় যে সকল কার্য্য করিয়াছে, সে সকলের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(১) আনন্দ ও শিক্ষাদান
(২) হিন্দুধর্ম্মমতের পুনরুজ্জীবন
(৩) সমাজের সংস্কারসাধন
(৪) দেশাত্মবোধের প্রচার
(৫) বাঙ্গালা ভাষার ঐশ্বর্য্যবর্দ্ধন

নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যে বাঙ্গালা নাটক ও বাঙ্গালার রঙ্গালয় পুষ্টি ও সৌন্দর্য্য অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কারণ—যখন এথেন্স বহু শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষায় সচেষ্ট, তখনই তাহার রঙ্গালয়ের চরম উন্নতি; জার্ম্মানী যখন মুদ্রাস্ফীতিতে ও জাতীয় অপমানে বিপন্ন ও জর্জ্জরিত তখনই জার্ম্মানীর নাট্যশিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছিল; আমেরিকা উৎকট অর্থনীতিক দুর্দ্দশার সময়ে "affirmed the strength of the human spirit that often proves so painfully blind and bestial under the whiplash of accumulated errors."

বাঙ্গালার শিক্ষাবিষয়ে তখন পুরাতনের সহিত নূতনের সঙ্ঘর্ষ—সংস্কৃত শিক্ষা উপেক্ষিত, ইংরেজী শিক্ষা সমাদৃত—অর্থাৎ যে ভাষায় ভারতীয় সংস্কৃতি ব্যাখ্যাত—যাহাতে হিন্দুর দর্শনাদি রচিত তাহা অবজ্ঞাত এবং যে ভাষা ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন নহে, অর্থকরী বলিয়া, তাহারই অনুশীলন; বাঙ্গালায় রাজনীতিক বিষয়ে তখন ইংরেজের শাসনে ও শোষণে দেশবাসীর মনে পরাধীনতার গ্লানির অনুভূতি হইয়াছে কিন্তু তাহা আত্মপ্রকাশের উপায়ের সন্ধান পাইতেছে না— বাঙ্গালী বুঝিয়াছে good government cannot be a substitute for self-government—ইংরেজের শাসন সুশাসনও নহে—তাহাতে দেশের বহু লোক কখন দুর্ভিক্ষে মরিতেছে, কখন অন্নকষ্টের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে—তাহারা

"অন্নাভাবে শীর্ণ চিন্তাজ্বরে জীর্ণ;" বাঙ্গালায় ধর্ম্মবিষয়েও তখন প্রবল পরিবর্ত্তন—ইংরেজী শিক্ষার ও সংস্কারের বন্যা সমাজে যে বহু আবর্জ্জনা আনিয়াছিল প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সাফল্য আশানুরূপ হয় নাই; তাহার পরে একদিকে সংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগের রক্ষণশীলতার সমর্থন ও তাহার গুণকীর্ত্তন—আর এক দিকে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগের শাস্ত্রীয় বচনের ব্যাখ্যা ও প্রচার—"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে, কে রাখিবে?"—আর একদিকে কলিকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস রামকৃষ্ণের হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের পথনির্দ্দেশ এবং স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক দেশাত্মবোধের সহিত আধ্যাত্মিকতার সম্মিলন—যেন প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সম্মিলন।

তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে চতুর্দ্দিক-ব্যাপ্ত সান্দ্র অন্ধকারে আলোক-বিকাশ দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা নাটক ও বাঙ্গালা রঙ্গালয় সেই দুঃসাধ্য সাধন করিয়াছে এবং তাহাতেই নিরস্ত না হইয়া আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও দান করিয়াছে। জীব ও উদ্ভিদের পক্ষে সূর্য্যালোক যাহা মানুষের পক্ষে আনন্দ তাহাই। সূর্য্যালোক ব্যতীত যেমন তরুলতায় পত্র-কুসুম-বিকাশ হয় না, আনন্দ ব্যতীত তেমনই মানুষ উন্নতিলাভ করিতে পারে না। সেই জন্যই রিচার্ড ওয়াগনার বলিয়াছেন—যিনি মানুষকে আনন্দ দিতে পারেন তাঁহার স্থান—সেই কাযের জন্য—মানব-সমাজে বিজয়ী বীরের স্থান অপেক্ষাও উচ্চে। কবি কোলরিজের উক্তি:—

"Joy is the sweet voice. Joy the luminous cloud.
We in ourselves rejoice!
And thence flows all that charms our ear or sight,
All melodies the echo of that voice,
All colours a suffusion from that light."

এই আনন্দলাভের চেষ্টা বাঙ্গালীর সমাজে পূর্ব্বে নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং সে প্রচেষ্টায়, পরোক্ষভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য অল্প উন্নতিলাভ করে নাই। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন :—

"কলিকাতা ঠনঠনে নিবাসী লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের ও শোভাবাজার নিবাসী গঙ্গানারায়ণ লস্করের পাঁচালী ; পাণ্ডুয়ার সন্নিহিত তাবা গ্রাম নিবাসী রামানন্দ অধিকারীর তুক্ক ; মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বেলডাঙ্গা নিবাসী রূপ অধিকারীর চপ ; বৰ্দ্ধমানান্তঃপাতী চুপী গ্রাম নিবাসী রঘুনাথ রায়ের (দেওয়ান মহাশয়ের) ও নরচন্দ্রের শ্যামাবিষয়ক গীত ; উলুসে গোপালনগর নিবাসী মধুসূদন কানের কীৰ্ত্তন ; বাঁশবেড়ে নিবাসী শ্রীধর কবিরত্নের আদিরস-সংক্রান্ত গীত ; গোপাল উড়ে, গোবিন্দ অধিকারী, বদনচন্দ্র অধিকারী, নীলকমল সিংহ, দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল, মদনমোহন মাষ্টার প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাদিগের সঙ্গীত ; এ সকলও বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধনপক্ষে সাধারণ সাহায্য করে নাই।"

দাশরথির পাঁচালী ও পরে মতিলাল রায়ের যাত্রা এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আনন্দপ্রদানই এ সকলের প্রত্যক্ষ ও মুখ্য উদ্দেশ্য ; কিন্তু সেই সঙ্গে শিক্ষাপ্রদানও হইত। সেই সকলের পরিণতি—বাঙ্গালা নাটকে ; এবং সেই জন্যই যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের নিয়মে সে সকলের স্থান নাটক অধিকার করিয়াছে—রঙ্গমঞ্চ যাত্রার আসরকে সরাইয়া আপনি লোককে আকৃষ্ট করিয়াছে। রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' হইতে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' এবং তাহার পরে অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট' হইতে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'—এ সবই আনন্দপ্রদানের উদ্দেশ্যে রচিত। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা "দুইজনে যখন তর্কবিতর্ক করিতেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দ হাসিয়া এ উহার গায়ে পড়িত।" সেই দিন হইতে বর্ত্তমান

সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা নাটক ও বাঙ্গালা রঙ্গালয় নানাকারণে দুঃখপীড়িত বাঙ্গালীকে আনন্দ দিয়া আসিয়াছে। তাহা অল্প প্রশংসার ও গৌরবের কথা নহে।

আর বাঙ্গালা নাটক আনন্দের মত লোককে শিক্ষাও দিয়া আসিয়াছে। শিক্ষাপ্রদানের জন্য যাঁহারা পুরাণের ও ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন,—অর্থাৎ যাঁহারা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক আখ্যানবস্তু গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জাতির ধাতুর সহিত পরিচয়-হেতুই তাহা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"কৃষ্ণ এ দেশে সর্ব্বব্যাপক।" কারণ "বাঙ্গালা প্রদেশে কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্ব্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে কৃষ্ণনাম। * * * ভিখারী 'জয় রাধে কৃষ্ণ' না বলিয়া ভিক্ষা চায় না। * * * (আমরা) বনের পাখী পুষিলে তাহাকে 'রাধে কৃষ্ণ' নাম শিখাই।"

বাঙ্গালা প্রথম প্রকাশিত নাটক 'ভদ্রার্জ্জুনে' কৃষ্ণকীর্ত্তি কীর্ত্তিত। পুরাণ বাঙ্গালী হিন্দুর নিকট সুপরিচিত ছিল—যাত্রা, টপ, কবি, পাঁচালী, কথকতা—এই সকলের মধ্য দিয়া পুরাণের কাহিনী জনসমাজে প্রচারিত ও পরিচিত হইত। মুসলমানরাও বাঙ্গালী—তাঁহারাও ঐ সকল কারণে পুরাণের বিষয় অবগত ছিলেন—ফিরিঙ্গী আণ্টনীও কবির দল গঠন করিয়া গান বাঁধিয়াছিলেন—

"যদি দয়া ক'রে তার আমায় এ বারে মাতঙ্গী—
ভজন পূজন জানিনে, মা, জাতিতে ফিরিঙ্গী।"

সেই জন্য যাঁহারা পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বন করিয়া—তাহাতে কল্পনার রঞ্জন দিয়া—নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেশের লোকের ধাতু ও সংস্কার বুঝিয়াই কায করিয়াছেন এবং সেই জন্যই তাঁহাদিগের কার্য্য সাফল্যলাভ করিয়াছে। পুরাণের শিক্ষা—ধর্ম্মের

জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়। সে কথা ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুযুধান কৌরব ও পাণ্ডব-বাহিনীর মধ্যে অবস্থিত অর্জ্জুনের জয়রথে সারথ্যতৎপর শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে :—

"যখন যখন ঘটে, ভারত, ধর্ম্মের গ্লানি ;
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনারে সৃজি আমি।
সাধুদের পরিত্রাণ বিনাশ দুষ্কৃতদের
করিতে সাধন
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম করি আমি যুগে যুগে
জনম গ্রহণ।"

বাঙ্গালা নাটকে পৌরাণিক আখ্যানবস্তু যে অধিক অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার কারণ—ইতিহাস পুরাণ অপেক্ষা জনগণের নিকট অল্পপরিচিত—তাহা প্রধানতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ; কেবল কিংবদন্তী ইতিহাসের অনেক ঘটনা রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু যাহা মুখে মুখে প্রচারিত হয়, তাহা অতিরঞ্জনে বা রঞ্জনের অভাবে বিকৃত হইয়া যায়। এ দেশের অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে সে ভোগ ভোগ করিতে হইয়াছে, অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা বিকৃতভাবে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। অবশ্য কিংবদন্তীর ফেনপুঞ্জতলে অনেক সময়ে সত্যের শীর্ণ ধারা প্রবাহিত দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সিরাজদ্দৌলার অত্যাচারের বিষয় উল্লেখ করা যায়। তিনি যে বর্ষায় নদীর প্রবল স্রোতে যাত্রি-নৌকা ডুবাইয়া দিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহাও যেমন—তাঁহার স্নানার্থিনী হিন্দুরমণী-হরণও তেমনই—কাশিমবাজারে তৎকালীন ফরাসী কর্ম্মচারীদিগের লিখিত বিবরণে পাওয়া গিয়াছে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে হিল প্রণীত 'Three Frenchmen in Bengal' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এই সকলের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ ঐতিহাসিকরা স্বীকার করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু কিংবদন্তী সে সকল কথা প্রচার করিয়া আসিয়াছে।

"Sifting of evidence, incessant questioning of authorities, relentless scrutiny of documents"—ইতিহাসে প্রয়োজন, কিংবদন্তীতে নহে।

পুরাণের ও ইতিহাসের শিক্ষা বাঙ্গালী বহুদিন বাঙ্গালা নাটকে ও বাঙ্গালা রঙ্গালয়ে পাইয়াছে। আমরা তাহাই বাঙ্গালা নাটকের ও বাঙ্গালা রঙ্গালয়ের দ্বারা প্রদত্ত প্রথম উপকার বলিয়া বিবেচনা করি।

দ্বিতীয় উপকার—হিন্দু ধর্ম্মমতের পুনরুজ্জীবন। বাঙ্গালায় মুসলমান-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাহেতু যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর উপর অনেক অত্যাচার হয় নাই, এমন নহে—সে সকলের মধ্যে ধর্ম্মান্তরিত-করণ অন্যতম। অবশ্য বহুস্থলে হিন্দু যে স্বেচ্ছায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বাঙ্গালার অবস্থা-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কটন বলিয়াছেন :—

"The Mahommedans of Eastern Bengal are almost all descended from low-caste or aboriginal Hindus who long ago embraced Islam in the hope of social improvement or from hard necessity."

সেরূপ কার্য্য ইংরেজরাও করিয়াছে। হাণ্টার স্বীকার করিয়াছেন :—

"Englishmen when their speculations failed turned Muhammadans to keep themselves from starving."

কিন্তু তথাপি মুসলমান হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাস নষ্ট করিতে পারে নাই—কারণ, ধর্ম্ম অন্তরের। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা সে বিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল করিয়াছিল। সেই জন্যই অমৃতলাল বসু বলিয়াছিলেন—"আমরা পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে বিজিত হই নাই—হিন্দু-কলেজেই আমাদিগের পরাজয় সম্পূর্ণ হয়।" দ্বিজেন্দ্রলাল শিক্ষিত হিন্দুর অবস্থা, ব্যঙ্গ করিয়া, বর্ণনা করিয়াছিলেন :—

"Curious commodities Human oddities
A queer amalgam of শশধর, Huxley and goose."

হিন্দু কলেজের শিক্ষায় দেশে যে উচ্ছৃঙ্খলতার উদ্ভব হইয়াছিল—তরুণরা যে ভুলিয়া গিয়াছিলেন :—

"Let knowledge grow from more to more
But more of reverence in us dwell."

তাহা হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য প্রথম চেষ্টা—ব্রাহ্ম-সমাজের। ব্রাহ্ম-সমাজ প্রথমে হিন্দুর আচার-ব্যবহার যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টাই করিয়াছিলেন—তাঁহারা বেদ অপৌরুষেয় বলিতেন এবং ব্রাহ্মণদিগকেই বেদাধ্যয়নের অধিকার দিতেন—ইত্যাদি ; কেবল ঈশ্বরোপাসনায় পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন। তাহার পরে ব্রাহ্ম-সমাজ হিন্দুর বহু আচার-ব্যবহার বর্জ্জন করেন, এবং সেই সময়ে কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করেন—ব্রাহ্মধর্ম্ম যিশুখৃষ্ট-বর্জ্জিত খৃষ্টধর্ম্ম। রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্ম্ম-মত হিন্দুধর্ম্ম-মত হইতে বিভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাঁহার 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থে তিনি বলেন—হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—সে ধর্ম্ম পরব্রহ্মের উপাসনা। রাজনারায়ণ বাবুর গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শনে' (১২৭৯ বঙ্গাব্দ) লিখিত হয় :—

"হিন্দুধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের একতা স্বীকার করায়, আমাদের বিবেচনায়, উভয় সম্প্রদায়েরই মঙ্গল। আমি যদি অন্যের সহিত পৃথক হইয়া একা কোন সদনুষ্ঠানে রত হই, তবে আমার একারই উপকার ; যদি সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেই সদনুষ্ঠানে রত হই, তবে সকলেই তাহার ফলভোগী হইবে। অল্প লোক লইয়া একটি নূতন সম্প্রদায় স্থাপনের অপেক্ষা বহুলোকের সঙ্গে পুরাতন ধর্ম্মের পরিশোধন ভাল। কেন না তাহাতে বহুলোকের ইষ্টসাধন হয়।"

ব্রাহ্মগণ বাঙ্গালায় হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের দ্বারা—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে—প্রবর্ত্তিত অনেক বিশৃঙ্খলা—মদ্যপান প্রভৃতির দমন

করেন, মতের স্বাধীনতার মধ্যে রাজনীতিক স্বাধীনতার জন্যও আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং যে সেবাকার্য্য শেষে স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় ব্যাপক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় তাহারও আরম্ভ করেন। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজ প্রচলিত সমাজ হইতে দূরে যাইয়া পড়িতেছিল এবং কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া ব্রাহ্মবিবাহ-সম্বন্ধীয় যে আইন বিধিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, আপনার কন্যার বিবাহে তাহারই বিরুদ্ধাচরণ করায় ব্রাহ্ম-সমাজে আঘাত পতিত হয়। সেই সময়ে বাঙ্গালায় বঙ্কিমচন্দ্রপ্রমুখ মনীষীরা হিন্দু-ধর্ম্মমতের পুনরুজ্জীবন-জন্য লেখনী ধারণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' 'কৃষ্ণ-চরিত্র' এবং 'নবজীবনে' ও 'প্রচারে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি তাহার প্রমাণ। বঙ্কিমচন্দ্রের গীতার ব্যাখ্যার সহিত কেবল বালগঙ্গাধর তিলকের গীতা-ব্যাখ্যার তুলনা করা যায়। তিনি অন্ধ রক্ষণশীলতার সমর্থক ছিলেন না—পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন স্বীকার করিতেন এবং আধ্যাত্মিকতার সহিত জাতীয়তার সম্মিলন-প্রয়াসী ছিলেন। সে বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মতের প্রচারক। স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা সেই মত আরও পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ কম্বুকণ্ঠে দর্পকারী বিদেশীয়দিগকে বলিয়াছিলেন :—

"আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।"

সে দান—আধ্যাত্মিকতা—তাহাই তিনি বুঝাইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের "সন্তানরা" বলিতেন—"জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই। আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা মলয়জসমীরণ-শীতলা, শস্যশ্যামলা"—জন্মভূমি। বিবেকানন্দ দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন :—

"বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা,

আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ—”

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ অভিন্ন ; এককে ছাড়িয়া অপরের স্থিতি দুঃসাধ্য—হয়ত অসাধ্য। সেই জন্যই হিন্দু-সমাজ বহু সম্প্রদায়ের ও সমাজের লোককে আত্মসাৎ করিয়াছে, কিন্তু ভারতীয়াতিরিক্ত জাতিসমূহের ন্যায় দিগ্বিজয়ী হইবার চেষ্টা করে নাই—ভিন্ন জাতিকে ছলে বলে কৌশলে হিন্দু-সমাজভুক্ত করিবার চেষ্টা করে নাই। হিন্দু বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, সে সকল দেশে আপনার সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার করিয়াছে—চীনে ও জাপানে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে—কিন্তু বলপূর্ব্বক বা প্রলুব্ধ করিয়া কোন সম্প্রদায়কে বা জাতিকে হিন্দু করিবার চেষ্টা ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে। বিশেষ হিন্দুর স্বধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা যেমন “করাল কৃপাণ-মুখে” নহে, তেমনই খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের মত প্রচারকার্য্যেও পরধর্ম্মের নিন্দায় নহে। তাহার স্বধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা আদর্শের মহত্ত্বের দ্বারা। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, সীতা-সাবিত্রীর পতিভক্তি, ভীষ্মের সংযম, দধীচির ত্যাগ—এই সকল হিন্দুর আদর্শ। ইংরেজী শিক্ষায় ও যুরোপের জড়বাদজর্জ্জরিত সভ্যতার মোহে বাঙ্গালী যখন এই সকল আদর্শ ভুলিয়া যাইতেছিল—তখন সেই সকল আদর্শের প্রতি লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য যে আন্দোলন, তাহাই হিন্দু-ধর্ম্মমতের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন। সেই আন্দোলনে বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেবচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রবন্ধ-লেখক, ‘প্রহ্লাদচরিত্র’-প্রণেতা রাজকৃষ্ণ, ‘চৈতন্যলীলা’, ‘সীতার বনবাস’ প্রভৃতি প্রণেতা গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি নাট্যকার। রঙ্গালয়ে ভক্তিরসাত্মক নাটকের অভিনয় দেখিয়া হিন্দু তাহার প্রাচীন আদর্শের সন্ধান পাইত—যেন আপনার হারান সত্তা ফিরিয়া পাইত। যাহারা বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেবচন্দ্র প্রভৃতির জ্ঞানগর্ভ, যুক্তিবহুল প্রবন্ধ পাঠ করে নাই, তাহারা রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিয়া ভগবদ্ভক্তিতে গদ্গদ হইয়া

অশ্রুবর্ষণ করিত—সেই অশ্রুতে তাহাদিগের মনের মলিনতা বিধৌত হইয়া যাইত। "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহু দূর।" দর্শকগণ রঙ্গালয় হইতে বিশ্বাস লইয়া গৃহে ফিরিত—শিখিত ও বুঝিত, যে ধর্ম্মের লীলাভূমি সমাজে তাহার জন্ম সেই ধর্ম্ম তাহারই দেশের বিততশতশাখ বিশাল ন্যগ্রোধ তরুর মত ত্রিতাপতপ্ত মানবকে অবারিত আশ্রয় ও স্নিগ্ধ ছায়া অকাতরে দিয়া আসিয়াছে এবং তাহাই তাহাকে আশ্রয় ও শান্তি দিবে। দর্শকরা বুঝিত, শাস্ত্রের উপদেশ—স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। সে বুঝিত, শাস্ত্রের কথা—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ"। দর্শক বুঝিত, সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ও গৃহীর ধর্ম্ম এক নহে—নির্ব্বৈর ও অহিংসা যত প্রশংসনীয়ই কেন হউক না, গৃহীর অনুষ্ঠেয় নহে। সে বুঝিত, এক স্থানে মনুষ্যত্ব সকল বিচারকে অতিক্রম করে—তাই রামচন্দ্রের বন্ধু গুহক চণ্ডাল। সে বুঝিত, ক্ষমতা অপাত্রে ন্যস্ত হইলে তাহার অপব্যবহারের আশঙ্কা থাকে—অর্জ্জুন পাশুপত অস্ত্র অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ব্যবহারে বিরত হইতে শিখিয়াছিলেন; দ্রোণাচার্য্য পুত্রস্নেহবশে পুত্র অশ্বত্থামাকে যে অস্ত্র দিয়াছিলেন, সে তাহার অপব্যবহার করিয়াছিল।

হিন্দুর পুরাণে ও ইতিহাসে উচ্চাদর্শের অভাব নাই—দধীচির ত্যাগের পার্শ্বে ধাত্রী পান্নার ত্যাগ অনায়াসে স্থান লাভ করিতে পারে; প্রহ্লাদের ভক্তির পার্শ্বে মীরার ভক্তি ম্লান বোধ হয় না। ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুর কথায় বাঙ্গালার দেশভক্ত তরুণদিগের কথা মনে পড়ে— হৃদয় গর্ব্বে ও চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হয়।

হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষা ও হিন্দু-সমাজের উচ্চ আদর্শ বাঙ্গালা নাটকে পাওয়া গিয়াছে এবং রঙ্গালয়ে অভিনয়-চাতুর্য্যে সে শিক্ষা ও সে আদর্শ সজীব করা হইয়াছে।

বাঙ্গালা নাটকের দ্বারা বাঙ্গালীর তৃতীয় লাভ—সমাজের আবশ্যক সংস্কার-সাধন। সমাজে নানা কারণে সংস্কারের প্রয়োজন ও প্রবর্ত্তন হয়। যখন সংস্কার কুসংস্কারে পরিণত হয় বা কুসংস্কার

সংস্কারের স্থান অধিকার করে, তখন সমাজ পঙ্গু হয়। বিজ্ঞ মেন বলিয়াছেন :—

কোন জাতি বা সম্প্রদায় এক সময়ে যে সকল প্রথার প্রবর্ত্তন করে—সে সকল সেই সমাজে ও সেই স্থানে তাহার উন্নতির জন্য প্রয়োজনহেতুই প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু তাহার পরে, অনেক ক্ষেত্রে "a process then commences, which may be shortly described by saying that usage which is reasonable generates usage which is unreasonable."

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ মানব-চরিত্র নখদর্পণে দেখিতেন। তাঁহারা কখনও আবশ্যক পরিবর্ত্তনের বিরোধিতা করেন নাই। সেই জন্যই সংহিতার পরিবর্ত্তন—মনুসংহিতার বিধিব্যবস্থার সহিত পরাশরসংহিতার বিধিব্যবস্থার তুলনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

নানা কারণে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই সকল কারণের মধ্যে জাতির জাড্য ব্যতীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য—মুসলমানের শাসনকালে আত্মরক্ষার্থ হিন্দুর কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন ও তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া যাওয়া এবং ইংরেজের শিক্ষায় পুরাতন সবই বর্জ্জনীয়—এই বিশ্বাস। তদ্ভিন্ন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সকল স্থলেই তাহার প্রভাব বিস্তার করে।

বাঙ্গালা নাটকে যে সকল প্রথার ও আচরণের সংস্কার বা পরিবর্ত্তন প্রয়োজন সে সকলকে সমাজের দুষ্টক্ষতরূপেই দেখান হইয়াছে। রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব', মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', দীনবন্ধুর 'বিয়েপাগলা বুড়ো' ও 'জামাই বারিক', অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট' ও 'বাবু', গিরিশচন্দ্রের 'বেল্লিক বাজার' ও 'বলিদান' প্রভৃতি সমাজের আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্য লোককে প্রেরণা দিয়াছে। এ সকলই সমসাময়িক নিন্দনীয় প্রথার পৃষ্ঠে নির্ম্মম কশাঘাত। 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' পশ্চিমবঙ্গে আদৃত হইয়াছিল। তাহা রচিত হইবার পরেও

রাসবিহারী পূর্ব্ববঙ্গে গানে কৌলীন্য-প্রথার বিকৃতিসম্ভূত ব্যবস্থাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি গানের বিষয়—এক কুলীন ব্রাহ্মণ বহুবৎসর পরে এক শ্বশুরালয়ের গ্রামে শ্বশুর বিশ্বনাথ বারোড়ীর বাড়ী যাইতেছিলেন। তাঁহার বহু পত্নী—বিশ্বনাথের বাড়ী কোথায় তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন; সেই জন্য সে গৃহ যে পল্লীতে অবস্থিত তথায় উপনীত হইয়া কোন গৃহের সম্মুখে গার্হস্থ্যকার্য্যে রতা কোন স্ত্রীলোককে দেখিয়া শিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"কোন্ পথে যাইব, মা গো, বিশ্বনাথ বারোড়ীর বাড়ী ?"

রাসবিহারীর গানের শেষ চরণ—

"যাহারে বলিলে 'মা গো' সে বটে তোমারি নারী।"

মধুসূদন যখন 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' লিখিয়াছিলেন, তখন ইয়ংবেঙ্গলের কাল। গিরিশচন্দ্রের 'বেল্লিক বাজার' এবং অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট' ও 'বাবু' প্রভৃতিও সমসাময়িক দুষ্ট প্রথার দোষোদ্ঘাটন। শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো রুপেয়া' এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আমরা ইচ্ছা করিয়াই রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' সম্বন্ধে কিছু বলিলাম না।

হ্যারিশন বলিয়াছেন—"Dickens made a series of novels serve as onslaughts on various social abuses." মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালও নাটকে তাহাই করিয়াছিলেন। কৌলীন্য-প্রথার নিন্দনীয় পরিণতি সমাজে মতপরিবর্ত্তনে ও অর্থনীতিক কারণে লোপ পাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 'একেই কি বলে সভ্যতা ?'র সময় অতীত হইয়াছে। 'জামাই বারিক' এখন কল্পনারাজ্য ব্যতীত আর কোথাও নাই। যদি সমাজে এখনও দুই চারিটি 'বুড় শালিক' বা 'বিয়েপাগলা বুড়ো' থাকে, তবে সে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য—সামাজিক প্রথাহেতু নহে। 'বেল্লিক বাজার' চোরা বাজারের মত নূতন পরিবেশে নূতন ভাবে দেখা

দিয়াছে কি না এবং 'বাবু'রা এখনও সমাজে বিচরণ করেন কি না, তাহা ভবিষ্যতে নাটককারেরা সমাজকে পর্য্যবেক্ষণের অণুবীক্ষণ-সাহায্যে দেখাইবেন।

বাঙ্গালা নাটক ও বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চ সমাজে আবশ্যক সংস্কার-সাধনজন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। সেই আন্তরিক চেষ্টা যদি সর্ব্বতোভাবে সফল না হইয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে—যাহা যত্নসহকারে করা হয়, তাহা যদি সিদ্ধিলাভ না করে, তবে—"কোহত্র দোষঃ?" কিন্তু চেষ্টা যে ফলবতী হয় নাই, এমন মনে করিবার কোন কারণ আছে বলিয়াও বোধ হয় না।

সে জন্যও বাঙ্গালা নাটক ও বাঙ্গালার রঙ্গালয় গর্ব্বানুভব করিতে ও গৌরব-লাভে অধিকার জানাইতে পারে। চেষ্টার গৌরব তাহাদিগের প্রাপ্য এবং তাহাও উপেক্ষণীয় নহে।

চতুর্থ কার্য্য—দেশাত্মবোধ-প্রচার।

ইহার আরম্ভ মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু মধুসূদনের পরবর্ত্তী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ও উপেন্দ্রনাথের সময়েও ইহা সুস্পষ্ট হইতে পারে নাই। তাহার কারণ সহজেই অনুমেয়। গিরিশচন্দ্র পরিণত বয়সে এই ভাব প্রচারের জন্য নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কয়খানি নাটকে যেমন ইংরেজের নিন্দা ছিল, তেমনই মুসলমানের কার্য্যে সহানুভূতি-প্রকাশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-সংস্থাপনের চেষ্টাও প্রকট হইয়াছিল। তাহার কারণ, ঐ সময়ে বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুন্ন হইয়াছিল। তখনই কুখ্যাত "লাল ইস্তাহার" প্রচার। ইহার কারণ অবশ্য ইংরেজের রাজনীতি। সেই সময়ে মুসলমানবহুল পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর প্রতি অত্যাচারের কারণ দেখাইতে যাইয়া কটন বলিয়াছিলেন :—

"For the first time in history a religious feud was established between them by the partition of the

Province. For the first time the principle was enunciated in official circles: Divide and Rule! The hope was held out that the Partition would invest the Mohamedans with 'a unity they had not enjoyed since the days of the old Mussulman viceroys and kings.' The Mohamedans were officially favoured in every possible way. 'My favourite wife' was a somewhat coarse phrase used by Sir Bamfylde Fuller to express his feeling."

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে দেশাত্মবোধের তূর্য্যনাদ ধ্বনিত হয়। টেনিশন লিখিয়াছেন :—

"This is truth the poet sings,
That a sorrow's crown of sorrow is remembering
happier things."

দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীকে প্রথমে তাহার পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করাইয়াছিলেন :—

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,—
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময় ;
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ।"

তাহার পরে তিনি সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন :—

"যদিও, মা, তোর দিব্য আলোকে ঘেরে আছে আজি
আঁধার ঘোর,
কেটে যা'বে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার
ললাটে তোর।

আমরা ঘুচাব, মা, তোর কালিমা।"

বঙ্গভূমি—

"দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।"

সমুদ্রে বাঙ্গালীর পরাক্রম-সম্বন্ধে হান্টার লিখিয়াছেন :—

"Religious prejudices combined with the changes of nature made the Bengalis unenterprising upon the ocean. But what they have been they may, ... again become......... In maritime courage, as in other national virtues, I firmly believe that the inhabitants of Bengal have a new career before them........."

দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীকে যে সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। বাঙ্গালী তরুণের বীরত্বে দেশ স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল ; আর যে বাঙ্গালী যুবক রিক্তহস্তে ভারতবর্ষ —পরাধীন ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, সেই সুভাষচন্দ্র বসুও একাধারে ম্যাট্‌সিনীর প্রেরণা, গ্যারিবল্ডীর বাহুবল ও কাভুরের রাজনৈতিক দক্ষতা সম্মিলিত করিয়া ভারতবর্ষের ভূমিতে প্রথম স্বাধীনতার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্কল্প—"আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা"—ব্যর্থ হয় নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্ট দেশপ্রাণ বীরদিগের উক্তিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্ম্মানদিগের আক্রমণে নিহত ফরাসী সৈনিক কাপ্টেন রবার্ট ডুবার্লের মৃত্যুর পূর্ব্বদিন লিখিত কথা মনে পড়ে :—

"This attack to-morrow, besides the inevitable emotion it rouses in one's thoughts, stirs in me a kind of joyous impatience, and the pride of doing my duty—which is to fight gladly and die victoriously. To the last breath of our lives, to the last child of our mothers, to the last stone of our dwellings, all is thine my country ! Make no hurry. Choose thine time to strike. If thou needest months, we will fight for months ; if thou needest years, we will fight for years—the children of to-day shall be soldiers of to-morrow.

Already, perhaps, my last hour is hastening towards me. Accept the gift I make thee of my strength, my hope, my joys, and my sorrows, of all my being filled with the passion of thee. Pardon thy children their errors of past days. Cover them with thy glory—put them to sleep on thy flag. Rise victorious and renewed, upon their graves. Let our holocaust save thee—*Patrie, patrie*."

দেশাত্মবোধাত্মক নাটকের অভিনয় যখন রঙ্গমঞ্চে হইত, তখন দর্শকদিগের মনে হইত :—

"যায় যেন জীবন চলে—
মা গো জগৎমাঝে তোমার কাজে
'বন্দে মাতরম্' বলে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন তাঁহার দেশাত্মবোধাত্মক নাটক রচনা করেন, তখন দেশের লোক—বিশেষ দেশের তরুণ সম্প্রদায় স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত—কেবল মনে করে—

"What pity is it
That we can die but once to save our country!"

বাঙ্গালা নাটকের পঞ্চম দান—বাঙ্গালাভাষার ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি।

'ভদ্রার্জুন' নাটক-প্রণেতা লিখিয়াছিলেন—"বাঙ্গালা ভাষা এখনও নবীনা ও অলঙ্কারপরিহীনা, এবং তাঁহার দরিদ্রাবস্থারও শেষ নাই।" ভাষার অবস্থা যখন এইরূপ তখন বাঙ্গালা নাটক-রচনা আরম্ভ হয়। ভাষার সংস্কার কি ভাবে হইয়াছে,—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আরব্ধ কার্য্য কিরূপ দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে—তাহার বিবরণ-প্রদানের স্থান আমাদিগের নাই। কিন্তু বাঙ্গালা নাটক যে সেই সংস্কার-সাধনে ও ভাষার ঐশ্বর্য্য-বর্দ্ধনে সহায় হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

১২৮৫ বঙ্গাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র "লিখিবার ভাষা" সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"বিষয় অনুসারেও ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা ও স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য। সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য—সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেব বাবুর প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাটুকু পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তার পর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে—কেন না, যাহা অসুন্দর মনুষ্য-চরিত্রের উপর তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে—লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং, এই সিদ্ধান্তানুযায়ী কায করিয়াছেন। তাহা তাহার রচনায় আমরা দেখিতে পাই। 'দেবী চৌধুরাণী'তে বর্ণনা:—

"বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালে জলপ্লাবনে, কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে—সেখানে একটু ঝিকিমিকি।"

কিন্তু বিষয়ের জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারামে' উড়িষ্যার ভাস্কর-কার্য্যের বর্ণনায় সংস্কৃতবহুল ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন:—

"এই দিব্যমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিতচেলাঞ্চল প্রবৃদ্ধ-সৌন্দর্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্ সম্মিলন-স্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপ প্রেমগর্ব্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা চীনাম্বরা তরলিতরত্নহারা পীবরযৌবন-ভারাবনতদেহা—

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ

এই সব স্ত্রীমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু?"

বঙ্কিমচন্দ্র যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্য-সম্পাদন অন্যবিধ রচনা অপেক্ষাও নাটকে সহজসাধ্য ও সুবিধাজনক। বাঙ্গালা নাটক-লেখকগণ তাহাই করিয়াছেন। 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকে কুলাচার্য্যের বক্তৃতা—

"তার পর সেই আপন অভীষ্ট—বেদাভিনিবিষ্ট আদিশূর রাজা কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক বেদবিজ্ঞ পঞ্চ বিপ্রকে রাজধানীতে আনয়ন করিলেন।"

দীনবন্ধু 'নীলদর্পণে' যে সকল চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাদিগের ভাষা—তাহাদিগেরই ব্যবহৃত ও উপযুক্ত।

গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের সৃষ্ট রঙ্গরহস্যপরায়ণ নরনারীর ব্যবহৃত ভাষাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এইরূপে বাঙ্গালার শব্দসম্ভার বর্দ্ধিত হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে ভাবপ্রকাশক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মধুসূদনের মত দুঃসাহসিক লেখকও নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার সুসঙ্গত জানিয়াও—ব্যবহার করেন নাই। তাহা কালোপযোগী হইবে না—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একাধিক নাট্যরচনায় মিত্র ও অমিত্রাক্ষর পয়ার (ভগ্ন পয়ার) ব্যবহার করিয়াছেন; তাহাতে রচনার সৌন্দর্য্যহানি হয় নাই—উক্তি-প্রত্যুক্তির গতি মন্থর হয় নাই।

গিরিশচন্দ্র ধ্বন্যাত্মক ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

বহু নাটক গদ্যে ও পদ্যে এবং গদ্যে লিখিত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, নাটকে চরিত্রবৈচিত্র্যহেতু ভাষার বৈচিত্র্য-প্রবর্ত্তন স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়াই বিবেচিত হয়। কারণ, নাটক প্রধানতঃ অভিনয়ের জন্য—দর্শকদিগের জন্য। বাঙ্গালা নাটকের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যে বহু নূতন শব্দ-প্রবর্ত্তনের উপায় হইয়াছে এবং যে সকল শব্দ যে ভাবে সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে এবং স্থান পাইয়া ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে ক্লাফের কবিতা মনে পড়ে;—

> "While the tired waves vainly breaking,
> Seem here no painful inch to gain,
> Far back through creeks and inlets making,
> Comes silent, flooding in, the main.

"And not by eastern windows only,
When daylight comes, comes in the light,
In front the sun climbs slow, how slowly,
But westward look, the land is bright."

অর্থাৎ—

"সম্মুখে নীলোর্ম্মিমালা ভাঙ্গি' পড়ে বেলাবালুপরে,
সূচ্যগ্র মেদিনী তা'রা যেন নাহি অধিকার করে—
পশ্চাতে চাহিয়া দেখ—শত ক্ষুদ্র খাতে প্রবাহিয়া
শান্ত সিন্ধুজলরাশি চারিদিকে পড়ে ছড়াইয়া।

"দিবস বিকাশে যবে—পূরবের গবাক্ষে কেবল
প্রবেশিয়া রবিকর কক্ষমধ্য করে না উজ্জ্বল;
সম্মুখে উদিত রবি অতি ধীরে পূরব গগনে—
পশ্চাতে চাহিয়া দেখ হাসে ধরা কনক-কিরণে।"

বাঙ্গালা ভাষা তাহার পুষ্টির ও শক্তির জন্য যেমন, বাঙ্গালা সাহিত্য তাহার সমৃদ্ধির জন্য তেমনই বাঙ্গালা নাটকের নিকট ঋণী।

রাজনারায়ণ বসু গঙ্গার গতির সহিত বাঙ্গালা কবিতার গতির উপমা দিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন :—

"গঙ্গা যেমন কলিকাতার দক্ষিণে ক্রমে প্রশস্ত হইয়া মহাকল্লোল-সমন্বিত বেগে সমুদ্রসমাগম লাভ করিয়াছেন, তেমনই বাঙ্গালা কবিতা সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষার সাহায্যে ভবিষ্যতে কত বিশাল ও ওজস্বী হইয়া সমীচীনতা লাভ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে?"

বাঙ্গালা নাটকও তেমনই ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের গুণসমন্বয়ে প্রতিভাবান্ লেখকদিগের হস্তে উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাহার পরিণতি কোথায় তাহা কে বলিতে পারে?

বাঙ্গালা নাটকের কৃত কার্যের গৌরব স্মরণ করিয়া এবং তাহার ভবিষ্যৎ গৌরব কল্পনা করিয়া—আশায় উৎফুল্ল হইয়া আমরা বাঙ্গালা

নাটকের এই দ্রুত—সুতরাং অসম্পূর্ণ—আলোচনা শেষ করিতেছি। বাঙ্গালা নাটক ও বাঙ্গালার রঙ্গালয়-সম্বন্ধে যে "ফলিয়াছে বহু আশা—ফলে নাই বহু আর," তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। যে বহু আশা পূর্ণ হয় নাই, তাহার জন্য নিরাশ হইবার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে করি না। কারণ, বাঙ্গালা নাটকের গতি আজ যদি মন্থর হয়, তবুও রুদ্ধ হয় নাই। বিশেষ পরিবর্ত্তিত রাজনীতিক পরিবেশে তাহার নূতন নূতন উপকরণ লাভ অনিবার্য্য। তাহার নীতি হইবে—

"Forward, forward, let us range"

"আগে চল, আগে চল—ভাই !
প'ড়ে থাকা পিছে,
ম'রে থাকা মিছে ;
বেঁচে ম'রে কিবা ফল, ভাই ?

প্রবন্ধশেষে আমরা যাঁহাদিগের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হইতে সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া—বাঙ্গালী পাঠক, বাঙ্গালী সাহিত্যিক, বাঙ্গালা রঙ্গালয়ের দর্শক যাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি।

সেই স্মরণীয়দিগের মধ্যে বাঙ্গালা নাটকের লেখকগণ সর্ব্বপ্রধান। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার দৈন্য, বাঙ্গালার রঙ্গালয়ের অভাব ও অপূর্ণতা, বাঙ্গালী দর্শকদিগের ঔদাসীন্য—এ সকল জানিয়াও দুর্গম ও অপরিচিত কণ্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মধুসূদনের মত অসাধারণ প্রতিভার অধিকারীকেও নাটক—তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক—অভিনয় করাইবার জন্য ধনীর মুখাপেক্ষী হইয়া ব্যর্থকাম হইতে হইয়াছিল। যাহারা মনে করে—"Poetry, history and philosophy ought to be suffered, like calico and cutlery, to find their proper price in the market"—তাহারা

যে স্থলে পৃষ্ঠপোষক সে স্থলে অপমান অনিবার্য্য। তথাপি এই সকল লেখক উৎসাহের আতিশয্যে ও সাহিত্যিক প্রেরণায়, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া—সকল দৈন্য ও দৌর্ব্বল্য দলিত করিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাঁহারা কবির প্রতিভা-ফুলবন-মধু লইয়া, এমন মধুচক্র রচনা করিবেন—

"গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

তারাচরণ হইতে মধুসূদন ও দীনবন্ধু, মধুসূদন ও দীনবন্ধু হইতে গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহাদিগের পরবর্ত্তীরাও এই কারণে বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন।

তাঁহাদিগের পরে আমরা বাঙ্গালার রঙ্গালয়ের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে স্মরণ করিব। তাঁহারা তাঁহাদিগের কার্য্যের জন্য অনেক ক্ষেত্রে প্রাপ্য আদর ও সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা উৎসাহে অবিচলিত থাকিয়া নাটক-সৃষ্ট চরিত্রকে জীবনে সঞ্জীবিত করিয়াছেন এবং কবি-কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিয়াছেন। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে মধুসূদন যে প্রশংসা করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষকে দীনবন্ধু যে আদর দিয়াছিলেন এবং রাধামাধব করকে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন—তাহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। তাঁহাদিগের নিকট দর্শক-সম্প্রদায়ের কৃতজ্ঞতার ঋণ অল্প নহে।

বাঙ্গালায় রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠায় যে ধনীরা অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন—নবীনচন্দ্র বসু, প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ভ্রাতৃদ্বয়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, আশুতোষ দেব, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার প্রভৃতি যাঁহারা বাঙ্গালায় জনসাধারণের জন্য রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠা সম্ভব করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও আজ আমরা স্মরণ করিতেছি।

বাঙ্গালী নাটককারের অনুরাগীদিগের প্রদত্ত অর্থে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার নাম স্মরণীয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া জ্ঞানবিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সর্ব্বশেষে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। এই বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশীর শাসন-কালেও বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলনে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এমন আশা অবশ্যই করিতে পারা যায় যে, উপযুক্ত অধ্যাপকের দ্বারা পথের সন্ধান পাইলে এই বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্র হইতে বাঙ্গালা নাটকের আরও উন্নতি-সাধনক্ষম বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইবে।